BHASATATWA

MA [Bengali]

Third Semester

BNGL 901C

Directorate of Distance Education

TRIPURA UNIVERSITY

Reviewer

Dr. Rejaul Karim

Professor of Allia University

Authors

Supriya Kumar Das: Units: (I, II, IV) © Reserved, 2016

Dr. Nityananda Mandal: Unit: (III) © Reserved, 2016

Books are developed, printed and published on behalf of **Directorate of Distance Education, Tripura University** by Vikas Publishing House Pvt. Ltd.

All rights reserved. No part of this publication which is material, protected by this copyright notice may not be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form of by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the DDE, Tripura University & Publisher.

Information contained in this book has been published by VIKAS® Publishing House Pvt. Ltd. and has been obtained by its Authors from sources believed to be reliable and are correct to the best of their knowledge. However, the Publisher and its Authors shall in no event be liable for any errors, omissions or damages arising out of use of this information and specifically disclaim any implied warranties or merchantability or fitness for any particular use.

Vikas® is the registered trademark of Vikas® Publishing House Pvt. Ltd.

VIKAS® PUBLISHING HOUSE PVT. LTD.
E-28, Sector-8, Noida - 201301 (UP)
Phone: 0120-4078900 • Fax: 0120-4078999
Regd. Office: 7361, Ravindra Mansion, Ram Nagar, New Delhi – 110 055
• Website: www.vikaspublishing.com • Email: helpline@vikaspublishing.com

সিলেবাস বই - ম্যাপিং টেবিল

সিলেবাস

প্রথম একক **(পৃষ্ঠা 1-10)**

দ্বিতীয় একক **(পৃষ্ঠা 11 - 34)**

তৃতীয় একক **(পৃষ্ঠা 35 - 69)**

চতুর্থ একক **(পৃষ্ঠা 71 - 84)**

সূচীপত্র

টিপ্পনী

প্রথম একক	(পৃষ্ঠা 1-10)
দ্বিতীয় একক	(পৃষ্ঠা 11 - 34)
তৃতীয় একক	(পৃষ্ঠা 35 - 69)
চতুর্থ একক	(পৃষ্ঠা 71 - 84)

ভূমিকা

টিপ্পনী

বাংলা ভাষার ভাষাবিজ্ঞান জানা খুবই প্রয়োজন। শব্দের উচ্চারণ, সঠিক প্রয়োগ, তার অর্থ নির্ধারণে ভাষাবিজ্ঞান পাঠ আবশ্যিক। এই মডিউলটি পাঠ নিলে আমরা বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিবর্তনের ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক ভাষার ধারণা আমাদের মধ্যে জন্ম নেয়। বাংলা ভাষার, বাক্যতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, বিবাক্ষতত্ত্ব এবং বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তার বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

প্রথম একক

'ক' গুচ্ছ

টিপ্পনী

ভূমিকা

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ভাষা বিজ্ঞানীরা ভাষার সংজ্ঞা দিতে মানুষের মুখে ব্যবহৃত শব্দের সাহায্যে অর্থপূর্ণ বাক্য সমষ্টিকে ভাষা বলে উল্লেখ করেছেন। প্রায় সব দেশের ভাষাবিজ্ঞানীরাই ভাষার সঙ্গে সমাজের সম্পর্কের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। সমাজবদ্ধ মানুষ নিজেদের প্রয়োজনে পরস্পরের মধ্যে যে অর্থপূর্ণ বাক্য ব্যবহার করে থাকে তাকে ভাষা বলে। ভাষাচার্য ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষার সংজ্ঞা দিয়ে বলেছেন-

> "মনের ভাব প্রকাশের জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন কোন বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ সমষ্টিকে ভাষা বলে।"

বিশিষ্ট পাশ্চাত্য ভাষা বিজ্ঞানী 'এডগার এইচ স্টাটেভান্ট' ভাষা সম্পর্কিত আলোচনায় বলেছেন-

"A Language is a system of arbitrary vocal symbols by which members of a social group co-operate and interact.

অর্থাৎ ভাষা হলো মানুষের মুখে উচ্চারিত শব্দ ধ্বনি সংকেত যার সাহায্যে একটি বিশেষ সমাজের অন্তর্গত মানুষেরা পরস্পরের মধ্যে ভাব বিনিময় করতে সক্ষম হয়। এখানে সমাজ বলতে বিশেষভাবে ভাষা সমাজের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ভাষাভাষি মানুষেরা বিভিন্ন ভাষা সমাজের অন্তর্গত হয়ে থাকে। আমরা বাঙালি হিসেবে বাংলা ভাষা সমাজের অন্তর্গত।

ইংরেজি 'Liangnisties' শব্দের অনুসরণে বাংলায় তার প্রতিশব্দ হিসেবে ভাষা বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ভাষা চর্চার একটি বিশেষ শাস্ত্র হিসেবে ভাষা

টিপ্পনী

বিজ্ঞান শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা ধ্বনি বিজ্ঞানের অন্তর্গত।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যে সমস্ত বিষয় শিক্ষার্থীদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে তা হলো -

(ক) ১। ধ্বনিবিজ্ঞান

২। ধ্বনিতত্ত্ব

৩। রূপতত্ত্ব

৪। অন্বয় বা বাক্যতত্ত্ব (Syntax)

৫। বাগার্থতত্ত্ব (Semanties)

৬। বিবাক্ষতত্ত্ব (Pragmatics)

(খ) ভাষা বিজ্ঞানের নানা দৃষ্টিভঙ্গি -

১। তুলনামূলক (Comparative)

২। ঐতিহাসিক (Historical)

৩। গ্রন্থনবাদী (Strueturalist)

৪। বর্ণনামূলক (Descriptive)

৫। সংবর্তনী - সজ্ঞননী (Transformational generative)

১। ধ্বনি বিজ্ঞান

মানবদেহের যে সমস্ত অঙ্গ প্রতঙ্গের সাহায্যে ভাষার স্বন বা বাগধ্বনি গুলি (phones) উচ্চারিত হয়ে থাকে তাদের বাগযন্ত্র (Organs of speech or Vocal organ) বলে। বাগযন্ত্রের গঠন ও প্রক্রিয়া হলো ধ্বনিবিজ্ঞানের প্রথম আলোচ্য বিষয়। শ্বাসবায়ু মুখগহ্বর ও নাসিকা দিয়ে যাতাযাত করার সময়ে তার গতিপথে আংশিক বা পূর্ণ বাধা দিয়ে বা তার গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করে যে তরঙ্গগুলি সৃষ্টি করা হয় তাদের ধ্বনিতরঙ্গ বা

(Sound waves) বলে। ধ্বনি তরঙ্গগুলি বাতাসের সাহায্যে শ্রোতার কানে গিয়ে পৌঁছায়। স্নায়ুর সাহায্যে আবার শ্রোতার কান থেকে মস্তিস্কে যায়। তার ফলে মস্তিস্ক সেই নিদিষ্ট ধ্বনি তরঙ্গগুলির সঠিক অর্থ ব্যাখ্যা করে। বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির তিনটি স্তর রয়েছে। এই স্তর তিনটি হলো (১) ধ্বনির উচ্চারন (Artienlation). (২) ধ্বনিতরঙ্গ সৃষ্টি (Sound wave), ৩. শ্রবণ (Audition)। ধ্বনির এই তিনটি স্তর নিয়ে ধ্বনি বিজ্ঞানের তিনটি শাখা গড়ে উঠেছে। সেগুলি হলো - (ক) ধ্বনির উচ্চারণ (artienlation) নিয়ে গড়ে ওঠা স্বনবিজ্ঞান (articulatory Phoneties), (খ) ধ্বনিতরঙ্গ গুলি যে শাখায় আলোচিত হয় তা হলো ধ্বনি তরঙ্গ বিজ্ঞান (Acoustics)। (গ) শ্রবণ প্রক্রিয়া নিয়ে গড়ে উঠেছে শ্রুতিমূলক স্বনবিজ্ঞান বা শ্রবণমূলক ধ্বনি বিজ্ঞান (Auditory Phonetics)।

টিপ্পনী

২। ধ্বনিতত্ত্ব

ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ধ্বনি সম্পর্কিত আলোচনাকে ধ্বনিতত্ত্ব বলা হয়। ইংরেজি Sound শব্দের অর্থ ধ্বনি হলেও ভাষা বিজ্ঞানে ধ্বনি শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যেমন পশুপাখির ডাক, গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ, হাততালি ইত্যাদিকে ব্যাপক অর্থে ধ্বনি বলে ধরা হলেও ভাষাবিজ্ঞানে ধ্বনি বলতে কেবল মনুষ্য কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনিকে আলোচ্য বিষয় হিসেবে গ্রহন করা হয়। মানুষের কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত ধ্বনিকে বলে স্বন বা বাগধ্বনি (Phone)। ধ্বনিতত্ত্বে সব রকম ধ্বনি নিয়ে আলোচনা করা হয় না। কেবল স্বন বা বাগধ্বনি (Phone) ও ধ্বনিতা বা স্বনিম (Phoneme) নিয়ে আলোচনা হয়ে থাকে। আলোচ্য বিষয়ভেদে ধ্বনিতত্ত্বের যে সমস্ত শাখা গড়ে উঠেছে তা হলো - ১. ধ্বনিবিজ্ঞান (Phonetics), ২. স্বনিম বিজ্ঞান বা ধ্বনিবিচার (Phonemics), ৩. স্বনিম প্রক্রিয়া বিজ্ঞান (Phonology)।

৩। রূপতত্ত্ব

এক বা একাধিক স্বনিমের সাহায্যে যে অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম এক গঠিত হয় তাকে মূলরূপ বা রূপিম (norpheme) বলে। মূলরূপের সাহায্যে কীভাবে শব্দ গঠিত হয়, শব্দ ও ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি ও প্রত্যয় কীভাবে যুক্ত হয় এবং তার ফলে শব্দরূপ ও ক্রিয়ারূপের যে আকার দেখা দেয় তা ভাষা বিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচিত হয় তাকে রূপতত্ত্ব বা মূলরূপ বিজ্ঞান (Morphology) বলে। সাধারনত মূলরূপ বিজ্ঞান

টিপ্পনী

(morphemics) ও রূপপ্রক্রিয়া বিজ্ঞান কে একত্রিত করে রূপতত্ত্ব নামক ভাষাবিজ্ঞান শাখাটি গড়ে উঠেছে।

৪। অন্বয় তত্ত্ব বা বাক্যতত্ত্ব (Syntax)

মনের ভাব প্রকাশের জন্য এক বা একাধিক মূলরূপ বা শব্দের সাহায্যে বাক্য (Sentence) গঠিত হয়। বাক্যের মধ্যে মূলরূপ গুলি সাজানোর কতকগুলি পদ্ধতি রয়েছে। এক মূলরূপের সঙ্গে অন্য মূলরূপের প্রকার ভেদও রয়েছে। বাক্যগঠনের পদ্ধতি ও প্রকার ভেদ নির্নয় করা বাক্যতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। কোনো কোনো ভাষা বিজ্ঞানী রূপতত্ত্ব (Murphotogy) ও বাক্যতত্ত্ব (Syntoy) কে আলাদা না করে তাকে ব্যাকরণ (Grammar) বলে উল্লেখ করে থাকেন। তাঁদের মত রূপতত্ত্ব (Morphology) ও বাক্যতত্ত্ব (Syntax) ব্যাকরণের দুটি উপশ্রেনী। আগে নির্দেশমূলক ব্যাকরণ (Normative grammar)বা ভাষা বিজ্ঞান (Lingnistics) বলতে ব্যাকরণ শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

৫। বাগার্থ তত্ত্ব (Semantics)

ভাষার ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যগঠন পদ্ধতিকে প্রাধান্য দিয়ে ধ্বনিতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব, বাক্য গঠনতত্ত্ব ইত্যাদি গড়ে উঠলেও ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে অন্য একটি বিশেষ দিক হলো অর্থগত (Content or meaning)। অর্থতত্ত্ব নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের অন্তর্গত শব্দার্থতত্ত্ব (Semantics) বিদ্যার শাখা সৃষ্টি হয়েছে। শব্দার্থ তত্ত্বের মধ্যে শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে সমাজতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্বকে প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। যেমন - পুরাতন যুগে দূতের মাধ্যমে প্রেরিত সংবাদকে বলা হতো সন্দেশ। সংবাদের সঙ্গে উপহার হিসেবে মিষ্টান্ন প্রেরণের রীতি থাকায় অধুনা সন্দেশ বা সংবাদ মূল অর্থ হারিয়ে মিষ্টান্নে পরিনত হয়েছে।

৬. বিবাক্ষ তত্ত্ব (Pragmaics)

বিবাক্ষতত্ব (Pragmaics) ভাষা বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা। সংকেত অর্থাৎ প্রতিমা - সূচক প্রতীকের ব্যবহারের ফলে যে অর্থপূর্ণ ভাষার সৃষ্টি তাকে বিবাক্ষতত্ত্ব বলে। ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে তা যুক্ত। পারস্পারিক কথোপকথন বা ভাব বিনিময়ের সঙ্গে যে সমস্ত আচার আচরন স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা শুধু ভাষাবিজ্ঞানের বিষয়

নয়, তার সঙ্গে দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, নৃতত্ত্বের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়।

বিবাক্ষবাদ (Pragmatics Stickle) অনুসারে বলা যায় শব্দার্থের পরিবর্তন শুধু ব্যাকরণ ও শব্দার্থতত্ত্বের পরিবর্তেনর উপর নির্ভর করে না। তার জন্য জানা প্রয়োজন কোন পরিবেশ এবং পরিস্থিতিতে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে তা ব্যবহৃত হচ্ছে, ঐতিহ্যগত প্রাক ধারণার উপর সেই অর্থ নির্ভর করে। ভাষা ব্যবহারকারীরা শব্দার্থের আপাতভ্রান্তি থেকে কিভাবে শব্দের মধ্যে অন্তর্নিহিত অর্থটি বুঝতে পারা যায় বিবাক্ষবাদ তা ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। শব্দার্থ শুধু ব্যাকরণ ও অভিধানের মধ্যে থাকেনা। সচল সমাজের মধ্যে তা অন্তর্লীন হয়ে থাকে। নিয়ন্ত্রণকারী যখন অতিথিকে ডাল-ভাতের নিমন্ত্রণ করেন তখন তিনি শুধু ডাল-ভাত খাওয়ার কথা বলেন না। তাঁর বাচনের মধ্যে যে বিনয়ের ভাব লুকিয়ে থাকে তা বিশেষ ভাষা সমাজের মানুষের পক্ষেই বোঝা সম্ভব। বক্তা ও শ্রোতার এই বোধ্যগম্যতা বা পারঙ্গমতা বিবাক্ষবাদ (Pragmatics) এর আলোচ্য বিষয়। তাই ভাষা বিজ্ঞানীরা বলেন - 'The ability to understand another speakers's mtended meaning is called pragmatic compltence.

'খ' - গুচ্ছ

ভাষা বিজ্ঞানের নানা দৃষ্টিভঙ্গি

১. তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান

পাশ্চাত্য ভাষা বিজ্ঞানীদের বিভিন্ন গবেষণার ফলে ভাষা বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে যে সমস্ত নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায় তার অন্যতম প্রধান ধারা হলো তুলনা মূলক ভাষা বিজ্ঞান চর্চা। ইউরোপীয় নবজাগরণের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে দূরত্ব কেটে যায় এবং চিন্তাগত ঐক্যের পরিচয় দেখা দেয়। ভৌগলিক অভিযান, ব্যাবসা, বাণিজ্য ও রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন দেশের মধ্যে সংযোগ বৃদ্ধিও পায়। ছাপা খানার উদ্ভব, সংবাদপত্রের আর্বিভাবে এই যোগাযোগ দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তারফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারি মানুষের সঙ্গে অন্য ভাষাভাষী মানুষের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। যার ফলে এক ভাষার সঙ্গে অন্যভাষার ঐক্য ও অনৈক্যগুলি সম্পর্কে ধারণা বিস্তৃতি লাভ করে।এই যোগাযোগের ফলে ভাষাতাত্ত্বিকদের মধ্যে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠতে থাকে। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোনস্ কলকাতায় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতায় গ্রীক, লাতিন, গথিক, কেলতিক, প্রাচীন পারসিক, আবেস্তীয় ইত্যাদি বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করেন। ঐ ভাষাগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্যগুলি তুলে ধরে তাদের উৎস হিসেবে এক অভিন্ন ভাষাবংশের কথা উল্লেখ করেন। তার উপরে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে তুলনামূলক ভাষাবিজ্ঞান এবং ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশের তুলনামূলক অধ্যয়ন ভাষা বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহন করে। তুলামূলক ভাষা বিজ্ঞান চর্চার বৈশিষ্ট্য হলো তা ভাষাকে নিজের দেশকালের পরিধি থেকে বাইরে এনে অন্যান্য ভাষার সঙ্গে তার যোগাসুত্র নির্দেশ করে ভাষার সর্বজনীন রূপটিকে আবিষ্কার করে এবং বিভিন্ন দেশেদর সংস্কৃতির মধ্যে ভাষাচর্চার সূত্রে মিলন ঘটাতে সক্ষম হয়। তাই এই ধারাকে সংস্কৃতিক ভাষাতত্ত্ব চর্চাও বলা যেতে পারে।

২। ঐতিহাসিক বা কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান

ভাষা সম্পর্কে আলোচনা, ভাষা বিশ্লেষণ ও ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়।

(ক) তুলনামূলক ধারা

(খ) ঐতিহাসিক বা কালক্রমিক ধারা

(গ) কালক্রমিক ও ঐতিহাসিক ধারা।

ঐতিহাসিক বা কালক্রমিক (Historical Diachronic) ভাষা বিজ্ঞানচর্চার ধারা তুলনামূলক ভাষা চর্চার পথ ধরে সৃষ্টি হয়। ভাষার উৎস, ইতিহাস ও তার ক্রম বিকাশ সম্পর্কিত আলোচনা ঐতিহাসিক বা কালক্রমিক ভাষা বিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য। ভাষার উৎস বা ইতিহাস জানতে হলে তাকে বিশেষ কালের পরিপ্রেক্ষিতে যখন বিচার করা হয় তখন তাকে ঐতিহাসিক বা কাল ক্রমিক বলা হয়। কালক্রমিক ভাষা বিজ্ঞান প্রধানত দুটি ধারায় বিভক্ত - ব্যাক্তিবৃত্তীয় ও জাতিবৃত্তীয়। মানুষের আজন্ম ভাষা ব্যবহারের রীতি-নীতি-কৌশলকে যখন বিচ্ছিন্ন অথচ প্রণালীবদ্ধ ও বিজ্ঞান সম্মতভাবে আলোচনা করা হয় তখন তাকে ব্যাক্তিবৃত্তীয় কালক্রমিক ভাষা বিজ্ঞান এবং যখন

মানুষকে একটি ভাষা সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত করে সেই ভাষা সম্প্রদায়ের ভাষার বির্বতনটিকে তুলে ধরা হয় তখন তা জাতি বৃত্তীয় কালক্রমিক ভাষা বিজ্ঞান চর্চার ত্বারা বলা হয় । এই উভয় ধারাকে নিয়ে ঐতিহাসিক বা কালক্রমিক ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ধারা সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেছে।

টিপ্পনী

৩ - গ্রন্থনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের একটি বিশেষরূপ হলো গ্রন্থনবাদী (Strictural Linguistics) দৃষ্টিভঙ্গি । ব্যাপক অর্থে গ্রন্থনবাদী ভাষা বিজ্ঞান বর্ণনামূলক ভাষা বিজ্ঞানের অংশ হলেও ব্যাপক অর্থে নয় একটি বিশেষ অর্থে গ্রন্থনবাদী ধ্বনি বিজ্ঞানের কথা উচ্চারিত হবে থাকে। বিশেষ অর্থকে বোঝানোর জন্য অনেকে গ্রন্থনবাদ বা গঠন সর্বস্বতা (Strneturalism) র কথা উল্লেখ করে থাকেন। আধুনিক যুগে ভাষা বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থনবাদ একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই ধারার সমর্থকদের মতে ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদির সমন্বয়ে তার অবয়ক পূর্ণাঙ্গরূপ গ্রহন করে। উদাহরন স্বরূপ বলা যায় যে দেহের কোনো বিশেষ বিশেষ অংশে আঘাত আলগলে তার অনুভূতি যেমন সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে যায় তেমনি বাক্যদেহের উপাদানগত কোনো ত্রুটি ঘটলে তা শুধু উপাদানের ক্ষেত্রে নয় সমগ্র বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভাষাকে একটি নিটোল গ্রন্থনে আবদ্ধ করে তার বিচার নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে গ্রন্থনবাদের মধ্যে যে বিরাট পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ করে বিশিষ্ট ভাষাবিজ্ঞানী ড. রামেশ্বর শ বলেছেন ,..... আগে ভাষাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদানে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হত বলে তাকে অনু-ভাষাবিজ্ঞান বলা হয় । আর আধুনিক Structural linguistics এ ভাষাকে তার পূর্ণ অখন্ড রূপে দেখা হয় বলে তাকে অখন্ড (Macro Linguistics) বলা যায়।' গ্রন্থনবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে একটি উদাহরন দিয়ে বুঝিয়ে বলা যায় ভাষাকে বিচ্ছিন্ন ফুলের মত নয়। তাকে সূত্রে গ্রথিত মালার মত করে দেখতে হয়।

৪.বর্ণনামুলক এককালিক ভাষা বিজ্ঞান

ভাষার অর্থ, রূপ, গঠন ইত্যাদি নিয়ে ভাষাবিজ্ঞানের যে শাখায় আলোচনা করা হয় তাকে বর্ণনা মূলক ভাষা বিজ্ঞান বলে। একটি বিশেষ কালের রূপ ধরে তার বিশ্লেষণ করা হয় বলে এই পদ্ধতিকে আবার এককালিক ভাষা বিজ্ঞান নামেও উল্লেখ করা হয়।

টিপ্পনী

বর্ণনাত্মক দৃষ্টি ভঙ্গিতে যে কোনো ভাষার রূপ, গঠন ও অর্থকে প্রয়োগের দিক থেকে বিশ্লেষণ করা হয়। ভাষা গঠন ও তার প্রয়োগ সবযুগে একরকমের থাকে না। তাই বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভাষাকে একটি বিশেষ কালের সঙ্গে যুক্ত করে তাকে বিশ্লেষণ করা হয় বলে তাকে এককালিক ভাষা বিজ্ঞান বলেও উল্লেখ করা হয়। বর্ণনা মুলক বা এককালিক দৃষ্টিভঙ্গিতে 'আম' শব্দটির গঠনরীতি বাখ্যা করলে দেখা যাবে আ + ম এই দুটি ধ্বনি মিশে তা গড়ে উঠেছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বা কালক্রমিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সং. আম্র > আধুনিক বাংলায় 'আম' শব্দে পরিণত হয়েছে। এভাবে বর্ণনামূলক, এককালিক ও ঐতিহাসিক কালক্রমিক পদ্ধতিতে ভাষা বিজ্ঞানের প্রকার ভেদ লক্ষ্য করা যাবে।

৫. সংবর্তনী - সঞ্জননী ভাষাতত্ত্ব

ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ডের ছাত্র নোয়াম আব্রাহাম চমস্কি বর্ণনামূলক ভাষা পদ্ধতিতে কাজ করতে গিয়ে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে নুতন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন তা সজ্ঞননীতত্ত্ব নামে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত। ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত Syntactic Structure গ্রন্থে চমস্কি ভাষা বিশ্লেষণের তিনটি মডেলের কথা বলেন। এই মডেল তিনটি হলো সীমাবদ্ধ অবস্থার ব্যাকরণ (First state Grammar), পদগুচ্ছ সংগঠনাকরন (Pharse Stature Grammar)ও সংবর্তনী ব্যাকরণ (Transformational Grammar) । ১৯৬৫ খ্রিষ্টাব্দে চমস্কির 'Aspect of Theory of Syntax' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তিনি ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত সংবর্তনী ব্যাকরণের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করেন। সেখানে তিনি জানান, বাক্য গঠনের কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়মের সাহায্যে বিভিন্ন ধরনের বাক্য নির্মান সম্ভব। এই অসংখ্য বাক্য তৈরি করার বিষয়টিকে তিনি বাক্য সজ্ঞানন বলে উল্লেখ করেন। যে ব্যাকরণ এই জাতীয় বাক্য তৈরির নিয়মগুলিকে সুগ্রথিত করে তাকে বলে সজ্ঞাননী ব্যাকরণ। সজ্ঞাননী ব্যাকরণের পদ্ধতি গুলি তিনটি কক্ষে ব্যাখ্যা করা যায়। এই কক্ষ তিনটি হলো - আন্বয়িক কক্ষ, ধ্বনিগত কক্ষ ও শব্দার্থগত কক্ষ।

আন্বয়িক কক্ষে বাক্যের কতকগুলি বিমূর্ত গঠন থাকে। বাক্য চলতে একটি গঠনগত শৃঙ্খলকে বোঝায়। এই গঠনগত শব্দ শৃঙ্খল হলো কতকগুলি ধ্বনির ক্রমান্বয়ে উচ্চারিত রূপ। যেমন - "রাম বড় ভালো ছেলে"। এখানে শব্দগুলি সাজিয়ে যে

গঠনগত শৃঙ্খল তৈরি করা হয়েছে তাই হল বাক্য।আর - র + আ + ম + ব + ড + ও + ড্ + আ + ল + ও + ছ্ + এ + ল্ + এ হলো একটি ধ্বনি শৃঙ্খল। ধ্বনিগত কক্ষে আন্বয়িক সূত্রের দ্বারা গঠিত যে বাক্যকে শব্দ শৃঙ্খল হিসেবে পাওয়া যায় সেই বাক্যের ধ্বনিগত দিকটিকে নিয়ে পর্যালোচনা করা যায়। সেখানে বাক্যের অর্থগত দিকটিকে ব্যাখ্যা করা হয় । ধ্বনিগতকক্ষ ও শব্দার্থগত কক্ষ হল ব্যাখ্যামূলক । আন্বয়িক কক্ষে প্রত্যেক বাক্যের জন্য একটি অধোগঠন ও একটি অধিগঠন থাকে। অধোগঠন শব্দার্থ তত্ত্বগত ও অধিগঠনে ধ্বনিগত ব্যাখ্যা করা।

টিপ্পনী

চমস্কি সংবর্তনী - সজ্ঞননী তত্ত্বে যে ধারনাগুলির কথা বলেছেন তাকে দেখানে হয়েছে। স্বতন্ত্র ভাবে দুইটি ধারনাকে নিয়ে তত্ত্বটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন -

ক. ব্যাকরণতত্ত্ব	১. বৈশ্বিক ব্যাকরণ (Universal Grammar)
	২. বিশেষ ব্যাকরণ (Particular Grammar)
খ. ভাষাবোধ	১. পারঙ্গমতাবোধ (Competence)
	২. ভাষাব্যবহার (Performence)
গ. বাক্যগঠনগত তত্ত্ব	১. অধোগঠন (Deep stricture)
	২. অধিগঠন (Surface stricture)
ঘ. বাক্য ব্যবহার তত্ত্ব	১. ব্যাকরণসম্মত বাক্য (Grammatical Sentence)
	২. গ্রহনযোগ্য বাক্য (Acceptance Sentence)

আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১. ভাষা কাকেবলে?

২. ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?

৩. বাক্যতত্ত্ব বলতে কী বোঝনো হয়েছে?

৪. সংক্ষেপে ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে উইলিয়াম জোন্সের অবদান সম্পর্কে আলোচনা

করুন।

৫. ভাষা বিজ্ঞান চর্চায় গ্রন্থবাদী দৃষ্টি ভঙ্গীর পরিচয় দিন।

উত্তর লিখে পাঠাবার প্রশ্নাবলী

টিপ্পনী

১. ধ্বনি বিজ্ঞান কাকে বলে ? ধ্বনি বিজ্ঞানে ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের ভূমিকা কী তা আলোচনা করুন।

২. তুলনামূলক ভাষা বিজ্ঞানের পরিচয় দিন।

৩. ঐতিহাসিক বা কালক্রিক ও বর্ণনামূলক বা এককালীন ভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. সংবর্তনী - সংজ্ঞননী ভাষাতত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

দ্বিতীয় একক

১. ইন্দো - ইউরোপীয় থেকে বাংলা সময়ক্রম ও শাখা বিস্তার

টিপ্পনী

বাংলা ভাষার আদি উৎস হলো ইন্দো - ইউরোপীয় ভাষা। ভাষার স্বাভাবিক পরিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ফলে মধ্যবর্ত্তী অনেকগুলি স্তর অতিক্রম করে বাংলা ভাষার উদ্ভব ঘটেছে। ইন্দো-ইউরোপীয় বা মূল আর্য ভাষা ভাষী জনগোষ্ঠী দক্ষিণ রাশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশ থেকে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে যায়। ইন্দো - ইউরোপীয় ভাষার একটি শাখা হলো ইন্দো - ইউরোপীয় ভাষা।

আদি আর্যদের একটি শাখা ইরান - পারস্য দেশের দিকে চলে যায় এর একটি শাখা আসে ভারতের দিকে। ইরানীয় শাখার প্রাচীনতম কীর্তি আবেস্তা ৮০০ খ্রি. পূর্বাব্দে রচিত হয়। ভারতীয় শাখার প্রাচীনতম হলো বেদ। বেদের রচনাকাল ১৫০০ খ্রি. পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রি. পূর্বাব্দ।

সুপ্রাচীন কালে ভারতে অনার্য জাতির লোকেরা বসবাস করতো । জাতি হিসেবে তারা অস্ট্রিক, দ্রাবিড় ইত্যাদি নামে পরিচিত ছিল। তারা যে ভাষায় কথা বলত তা ছিল আর্যভাষা থেকে সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। পরবর্তী সময়ে আর্যজাতির মানুষেরা ইরান-পারস্য দেশ হয়ে ভারতে এসে বসবাস শুরু করে। অনুমান করা যায় আর্যভাষা ভারতে এসে যে রূপ লাভ করেছিল তার চিহ্ন রয়েছে ঋকবেদে । ঋকবেদে শুধু ভারতের প্রাচীন গ্রন্থ নয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির সঙ্গে ঋকবেদের নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। ঋক, সাম, যজুঃ, অথর্ব এই চারবেদ ও তার পরবর্তী ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষাকে বৈদিক ভাষা নামে অভিহিত করা হয়। প্রাচীনকালে এই ভাষার নাম ছিল ছান্দম বা ছন্দঃ । তাই এই যুগটির বৈদিক সংস্কৃতের যুগ নামে উল্লেখ করা হয়। আনুমানিক ১৫০০ খ্রিঃ পূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রি. পূর্বাব্দ পর্যন্ত কালসীমানায় ব্যাপ্ত এই যুগটিকে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা (O.I.A) যুগ বলে পরিচিত।

আদি আর্যভাষা এশিয়া মাইনরের পূর্বপ্রাপ্তি ও উত্তর মেসোপটেমিয়ার পথ দিয়ে পারস্য ও আফগানিস্থান হয়ে ভারতে এসে পৌঁছায়। খ্রি. পূর্ব ৮ম শতাব্দীর মধ্যে

টিপ্পনী

পাঞ্জাব থেকে উত্তর বিহার পর্যন্ত তাদের বিস্তৃত ঘটে। পরবর্তীকালে বিরাট দেশ জুড়ে আর্যভাষা ছড়িয়ে পড়ায় তা এদেশের প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অস্ট্রিক ও দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে মিশে যায়। তার ফলে আদি আর্যভাষার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। যার ফলে ৬০০ খ্রি. পূর্বাব্দ থেকে ৯০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা মধ্যভারতীয় আর্যভাষা (M.I.A) রূপ লাভ করে। এ যুগের আর্যভাষা প্রকৃত- অপভ্রংশ ভাষাকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল। অশোকের শিলালিপিও সংস্কৃত নাটকের মধ্যে ব্যবহৃত প্রাকৃত জৈনধর্মগ্রন্থ ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে ব্যবহৃত পালি ভাষায় তার পরিচয় রয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বিভিন্ন ব্যবহৃত ধ্বনি পাশাপাশি থাকতো। কিন্তু প্রকৃতস্তরে এসে দুই বা ততধিক ব্যাঞ্জন মিলে যে দ্বিত্ব বা দীর্ঘ উচ্চারণ হতো তা একক ব্যাঞ্জনে পরিনত লাভ করে। যেমন - ধর্ম্ম > ধম্ম, ভক্ত > ভত্ত, অষ্ট > অট্ঠ হিত্যাদি। সংযুক্ত ব্যাঞ্জনধ্বনির মধ্যে একটি আবার অন্যটির সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজের প্রকৃতি বদল করে। যেমন সত্য > সচ্চ, প্রশ্ন > পন্হ ইত্যাদি। এই জাতীয় ব্যাঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তন ভারতীয় আর্যভাষায় দ্বিতীয় যুগ বা মধ্যভারতীয় আর্যভাষা যুগের সূত্রপাত করে।

প্রাকৃত আবার বিভিন্ন প্রদেশে প্রধানত উদীত, মধ্যদেশীয়, প্রাকৃত এই তিনটি রূপ লাভ করে। কালক্রমে এই তিনধরনের প্রাকৃত ভেঙ্গে শৌরসেনী, মহারাষ্ট্রী, মাগধী ও অর্ধমাগধী, পৈশাচী, দাক্ষিনত্য ইত্যাদি রূপলাভ।

প্রাদেশিক প্রাকৃতগুলি আবার পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষা (N.I.A) যুগের সৃষ্টি করে। এ যুগের কালসীমা ৯০০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত বিস্তৃত। আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা, হিন্দী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, অরধী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। বৈদি, প্রাকৃত ও অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষাগুলির বিকাশ ঘটেছে। উল্লেখযোগ্য যে, মাগধী অপভ্রংশকেই বাংলা ভাষার জননী বলে ভাষা তাত্ত্বিকরা অভিমত প্রকাশ করেছেন।

অন্যান্য আধুনিক আর্যভাষার মত বাংলা ভাষার সমস্ত বা নিজস্ব শব্দ আদি আর্যভাষা ও প্রাকৃতের স্তর অতিক্রম করে বাংলা শব্দ ভান্ডারে স্থান লাভ করেছে।

যেমন - সং. অদ্য > ভ্রা. ভ্রা. অজ্জ > আং. বাং. আজ।

সংস্কৃত ও বৈদিক ব্যাকরণে যে সমস্ত প্রত্যয় ও বিভক্তিগুলি ছিল তার মধ্যে

কিছু প্রকৃতের মধ্য দিয়ে বাংলায় বিবর্তিত হয়ে এসেছে। যেমন - সং. হস্তেন > প্রা. হত্থেন > প্রা. বাং হাত্থেঁ > আ. বাং হাতে। সং. চলিদব্য > প্রা. চলিতব্য > বাং চলিব। এইভাবে প্রাচীন বৈদিক যুগের ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে বাংলা সহ হিন্দী, ওড়িয়া, অসমিয়ার মত আধুনিক ভাষাগুলি সৃষ্টি করেছে।

টিপ্পনী

২. ভারতের অন্-আর্য ভাষা বংশ ও বাংলা সম্পর্কের চিহ্ন

আর্যভাষা বলতে আমরা প্রধানত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে জাত ভাষা গুলিকে মনে করি। কিন্তু তার বাইরে যে সমস্ত ভাষা বংশ রয়েছে সেগুলিকে অন্-আর্যভাষা বলে উল্লেখ করা হয়। তার মধ্যে প্রধান হলো অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, ভোট-টীনীয়। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাদের নাম দিয়েছেন নিষাদ, দ্রবিড় বা দ্রমিড়, কিরাত। কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক সেমিটিক ও নিগ্রো জাতির ভাষাকে মৃত বলে উল্লেখ করলেও অধ্যাপক ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু আন্দামান অঞ্চলে প্রায় বিলুপ্ত জাতির মধ্যে নিগ্রোবটু (Nigrito) ভাষার অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন।

অস্ট্রিক (নিষাদ) ভাষাবংশ

পশ্চিম এশিয়া থেকে আগত প্রত্ন - অস্ট্রালয়েড় জাতির যে দলটি ভারতে এসে পৌঁছায় তাদের সঙ্গে ভারতের আদিম অধিবাসি নিগ্রোদের সংমিশ্রনে অস্ট্রিক জাতির সৃষ্টি হয়। তাদের ব্যবহৃত ভাষা হলো অস্ট্রিক। অস্ট্রিক ভাষার প্রধান দুটি শাখা হলো - অস্ট্রো- এশিয়াটিক ও অস্টোনেশিয়ান। অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষার মধ্যে ভারতীয় অস্ট্রিক ভাষা ছাড়াও ইন্দো-চিন ও ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, কম্বোজ ইত্যাদি অঞ্চলের কতকগুলি ভাষা তার অন্তর্গত। পশ্চিমবঙ্গের নিকটবর্তী বিহারের ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনার সাঁওতালি, রাঁচিতে ব্যবহৃত মুন্ডারি, সিংভুমের হো, বিহারের দক্ষিণে খড়িয়া,ভুমিজ, উড়িষ্যার শবর ও গদর, মহারাষ্ট্রের কোরুকু ভাষা এই ভাষাংশের অন্তর্গত। অস্ট্রনেশিয়ান ভাষার ধারাটি এশিয়ার বাইরের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জে এর ভাষা হিসেবে পরিচিত।

অস্ট্রিক ভাষাবংশ এর প্রভাব বাংলায় সবচেয়েবেশি দেখা যায়। এই ভাষাবংশ জাত কিছু শব্দ সংস্কৃত ভাষার মাধ্যে বাংলা শব্দভান্ডারে গৃহীত হয়েছে। যেমন তাম্বল, কদলী, অলাবু (লাউ) ইত্যাদি। ড. ক্ষুদিরাম দাসের মতে যে সমস্ত শব্দকে আর্যভাষা

টিপ্পনী

থেকে আগত বলে মনে করি তার মধ্যে বেশ কিছু শব্দ রয়েছে যা অস্ট্রিক উৎস থেকে জাত। খোকা, খুকি, খুঁটি, বিল, বিবি, ঝিঙ্গা ইতভাদি শব্দ অস্ট্রিক থেকে বাংলা ভাষায় এসেছে।

দ্রবিড় বা দ্রমিড় ভাষা বংশ (Wse Semi Bold Type)

ভারতীয় আর্যভাষায় অস্ট্রিক (নিষাদ) ভাষাবংশ জাত শব্দ ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করলেও দ্রবিড় বাংলা ভাষায় তেমন আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি। মূলত সংস্কৃত ভাষার প্রভাবে বাংলা ভাষার সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা সত্য যে, ভারতীয় ভাষা সমূহে আর্যভাষার পরেই দ্রবিড়ের স্থান দাক্ষিনাত্যে তামিল, মালায়ালম, কিন্নড় ও তেলেগু হলো প্রধান ভাষা। তাছাড়া কোডগু, তোডা, বদগ, কোলামি ইত্যাদি ভাষাতেও দ্রবিড় প্রভাব রয়েছে। কোনো কোনো ভাষাতাত্ত্বিক মনে করে থাকেন আদি আর্য ভাষায় ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ, ইত্যাদি মূর্ধণ্যধ্বনি ছিল না তা তামিলভাষা থেকে এসেছে। এই দাবী আবার অনেক ভাষাতাত্ত্বিক অগ্রাহ্য করেছেন। শব্দ ও বাক্যের প্রথমে শ্বাসঘাতের ব্যবহার দ্রবিড় ভাষার প্রভাব থেকে এসেছে। ধ্বনিগত বৈশিষ্ট্যের মত রূপগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেও বাংলায় তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় যৌগিক ক্রিয়াপদের ব্যবহারে তার চিহ্ন রয়েছে। সমাপিকা ক্রিয়ার পদের পরিবর্তে বাংলায় শতৃ-শানচ্প্রত্যয় যুক্ত নামপদের ব্যবহার দ্রবিড় থেকে প্রকৃতের মাধ্যমেএসেছে। বাংলায় বহুবচনাত্মক গুলা, গলির মত বিভক্তিও অনেকের মতে তামিল ভাষা থেকে এসেছে। বাংলা শব্দভান্ডারে পিলে, উলু, অনল, কজ্জল, কুন্তল, কুন্ডল, চন্দের মত নানা শব্দ আমরা তামিল থেকে এসেছে।

ভোট-চীনীয় (Simo-Tebetan) ভাষাবংশ

ভোট-চীনয় ভাষা বংশের দুটি শাখা হলো ভোট বর্মী ও শ্যাম-চীনীয়। ভারতীয় ভাষায় ভোট-বর্মী ভাষা বংশের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তার চারটি উপশাখার নাম - (১) হিমাচলীয় ভাষা, (২) উত্তর আসামের ভাষা, (৩) আসাম-বর্মী ভাষা, (৪) তিব্বতীয় বা ভোটভাষা। আসাম - বর্মী উপশালার দুটি ভাষা পরিবার। তার একটি হলো বোডো ও নাগা আর অন্যটির অন্তর্গত হলো বর্ম কুকী চীন, কাচীন ভাষার পরিবার। কেডিভাষা শুধু আসামে নয়, একদা বাংলা বিহার পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ কিরেছিল।এই উপশালার অন্তর্গত

কোচ রাভাও সেচ উত্তরবঙ্গের কোচবিহার অঞ্চলে, কাছাড়ে, কাছাড়ি, ত্রিপুরায় টিপ্‌রা এবং মেঘালয়ে গারো ভাষার রূপ গ্রহন করেছে।

আন্দামানী (Andamanese)

আন্দামানে অধুনা প্রায় বিলুপ্ত নিগ্রোবটু (Nigrito) ভাষার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এই ভাষা বহৎ আন্দামনী ও ক্ষুদ্র আন্দামানী ভাষা এক সময় বহু মানুষ ব্যবহার করতো। কিন্তু বর্তমানে এই ভাষা সম্প্রদায়ের লোক সংখ্যা মুষ্টিমেয়। ক্ষুদ্র আন্দামানীর অন্তর্গত দুটিজাতি হলো জারোয়া ও ওঙ্গী। দুই জাতির লোকেরা জারোয়া ও ওঙ্গী নামক দুটি পৃথক ভাষা আন্দামানে ব্যবহৃত হয়। ভারত সরকার পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আন্দামানে বসবাসের সুযোগ করে দেওয়ায় আন্দামানীদের সঙ্গে বাঙালীদের সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠলেও বাংলায় আন্দামানী প্রভাব নিয়ে আলোচনার সময় এখনো হয়নি।

টিপ্পনী

৩. বাংলা ভাষার নানা পর্যায়

ভাষাতাত্ত্বিকেরা অনুমান করে থাকেন ৯০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে মাগধী অপভ্রংশে অবহট্‌ঠের বিবর্তনের ফলে বাংলা ভাষার উল্লেখ ঘটেছে। বাংলা ভাষার তিনটি স্তর - (১) প্রাচীন বাংলা ভাষা (২) মধ্যবাংলা ভাষা (৩) আধুনিক বাংলা ভাষা। মধ্যবাংলা আর আদি মধ্য বাংলা ও অন্ত্য - মধ্য দুটি উপস্তরে বিন্যস্ত।

প্রাচীন বাংলা ভাষা

প্রাচীন বাংলা ভাষার কাল সীমা হলো আনুমানিক ৯০০ থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত। ১২০০ থেকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা ভাষার কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় নি। তাই এই যুগটি বাংলা সাহিত্যের অন্ধকার যুগ বলে উল্লেখ করা হয়। সেজন্য ভাষাতাত্ত্বিকেরা প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমাকে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন।

প্রাচীন বাংলা ভাষার কালসীমার চর্যাপদ, সংস্কৃত অমর কোষ গ্রন্থের সর্বানন্দের টীকা, বৌদ্ধকবি ধর্মদাসের বিদগ্ধমূলমন্ডল ও সেক - শুভোদখার অন্তর্গত কয়েকটি পদ পাওয়া গিয়েছে। তবে ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রধান চর্যাপদের ভাষার ওপর ভিত্তি করে প্রাচীন বাংলাভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক

টিপ্পনী

বিশ্লেষণ করায় প্রাচীন বাংলা ভাষা ও চর্যাপদের ভাষা প্রায় সমার্থক হয়েউঠেছে।

ধ্বনিগতবৈশিষ্ট্য :

১. সমযুগ্মব্যঞ্জন সরল ও পূর্ববর্তী হ্রস্বধ্বনি দীর্ঘ হলো । যেমন - ধর্ম্ম>ধম্ম>ধাম, কর্ম্ম>কম্ম>কাম ইত্যাদি।

২. নাসিক্য ব্যাঞ্জন ধ্বনির পূর্ব স্বর দীর্ঘ হল এবং নাসিক্য ব্যাঞ্জধ্বনি ক্ষীন হয়ে সানুনাসিক স্বরধ্বনিতে পরিণত হলো। যেমন - মাঝেঁ, সাঁদে ইত্যাদি।

৩. পদান্তে স্বরধ্বনি বজায় থাকলেও অনেক সময় যুক্তাক্ষর 'ইঅ' বা 'ঈ(ই)' কারে পরিণত হয়। যেমন - জ্বলিত > জলিত, উত্থিত > উট্‌ঠিত ইত্যাদি।

৪. 'য়' শ্রুতি ও 'ব' শ্রুতির ব্যাবহার ছিল। যেমন - নিয়ড়ি, আবয়ি ইত্যাদি।

৫. স্বর মধ্যবর্তী এককমহাপ্রান ধ্বনি 'হ' কারে পরিনত হয়। যেমন - মহাসুহ।

রূপগত বৈশিষ্ট্য

১. ষষ্ঠীর পদ গঠনে 'র', 'অর', 'এর' বিভক্তি ব্যবহার করাহতো যেমন - রূখের. দাহের, দোম্বিএর ইত্যাদি।

২. গৌনকর্ম ও সম্প্রদানের পদ গঠন করতে 'ক', 'কে', 'রে' ইত্যাদি বিভক্ত ব্যবহার করা হতো। যেমন - ঠাকুরক, বাহবকে, রসরসনারে ইত্যাদি।

৩. সপ্তমীর পদগঠনে 'ই', 'এ', 'হি', 'ত' বিভক্তি যোগ করা হতো। যেমন - নিয়ড়ি, চীত্র, হিয়াহি, সাঙ্কমত, ইত্যাদি। কখনো সপ্তমীতে সংস্কৃত 'এন' জাত 'এঁ' বিভক্তি প্রয়োগ করা হয়েছে।

৪. অপাদানে সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ ছিল । যেমন - ডোম্বিত । পঞ্চমীতে অপভ্রংশ থেকে আগত 'হুঁ' বিভক্তিরব্যবহার দুবার পাওয়া গিয়েছে। যেমন - থিপুহুঁ, রঅনহুঁ।

৫. তৃতীয়ার 'তেঁ' বিভক্তির ব্যবহার ছিল । যেমন দুখেতেঁ। তৃতীয়ায় 'এন্' জাত 'এঁ' বিভক্তির ব্যবহার দেখা গিয়েছে। যেমন বোঁহে, মতিত্রঁ ইত্যাদি।

৬. সংস্কৃত বহুবচনের অক্ষে ও তুঙ্গেপদদুটির একবচনেও ব্যবহার দেখা যায়। 'হাঁউ', 'হুঁ' জাতীয় প্রাচীন একবচনের পদ কিন্তু তখনও লুপ্ত হয়নি এবং তার ব্যবহহার

ছিল।

৭. অতীতকালে 'ইল' এবং ভবিষ্যৎকালে 'ইব' বিভক্তির প্রয়োগ ছিল। যেমন - বুঝিল, ভাইব ইত্যাদি।

৮. চর্যাপদে কতকগুলি বিশিষ্ট প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন - দুহিল দুধু, ডান্ডি ন বাসসি।

টিপ্পনী

মধ্য বাংলা ভাষা

মধ্যযুগের বাংলাভাষাকে দুটি কালসীমায় বিভক্ত করা হয়। যেমন-

ক. আদি-মধ্য বাংলা ভাষা (১৩৫০ - ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দ)

খ. অন্ত্য-মধ্য বাংলাভাষা (১৫০১ -১৭৬০ খ্রিস্টাব্দ)

ক. আদি-মধ্যবাংলা(শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের ভাষা)

১.'আ' কারের পরিস্থিত 'ই' কার ও 'উ' কার ধ্বনির ক্ষীনতা এবং দ্বি-স্বরতা লাভ এ যুগের ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যেমন -

বধূ> বহু, মুকুট > মউর।

২. মহাপ্রাণ বর্ণের ক্ষীনতা প্রাপ্তি এ যুগের ভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য। যেমন - কাহ্ন > কান, ব্রাহ্মণ > বামন ইত্যাদি।

রূপগত

১. 'রা' - বিভক্তি কোনো কর্মকারকের পদ গঠন করা হতো।

২. অতীতের জন্য 'ইল' ভবিষ্যতের জন্য 'ইব' - অন্ত বিভক্তি কর্তৃবাচ্যে ব্যবহার করা হত। যেমন - মো শুনিলোঁ, মো করিবোঁ।

৩. যৌগিক ক্রিয়া পদে 'আচ্' ধাতুর ব্যবহার ছিল। যেমন - লইছে, রহিলছে ইত্যাদি।

৪. অভিমুখ ও প্রতিমুখ বঝাএ গিয়া ও সিয়া এই দুই অশুসর্গ ব্যবহৃত হতো।যেমন দেখসিয়া, দেখগিয়া।

টিপ্পনী

খ. অন্ত-মধ্য যুগের বাংলা ভাষা

ধ্বনিগত

১. ধ্বনি পদ্ধতির সরলাএযুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন কালি > কাইল, সাধু > সাউধ।

২. ঢ় - কার এবং 'হ্ন' বা 'ক্ষ' জাতীয় সাধিক্য মহাপ্রানের মহাপ্রানতা লোপের প্রবনতা দেখা যায়। যেমন - বুঢ়া > বুড়া, কাহ্নু > কানু, আক্ষার > আসার ল

৩. শব্দান্তে 'অ' ধ্বনির লোপ। যেমন - ভাত > ভাৎ, দাস > দাস্।

৪. 'উয়া', 'ইআ' থেকে 'অ্যা' ধ্বনির প্রচলন ঘটেছে। যেমন - বানিয়া > বান্যা, জালিয়া > জেল্যা।

৫. 'উয়া' হয়েছে 'ও'। যেমন - সাথুয়া > সেথো, মধুয়া > মেধো ইত্যাদি।

রূপগত

১. বহুবচনে 'রা' ধ্বনির ব্যবহার ও নির্দেশক বহুবচনে গুলা, গুলি, দি, দিগ ইত্যাদি বিভক্তির প্রচলন ছিল।

২. অতীতকাল বোঝাতে 'হল' এবং ভবিষ্যতের চিহ্ন 'হৈব'। মুই করিলাই, ভাঙ্গিব দাঁত।

৩. যৌগিক কালের বহুল প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন - আসিছি, যেছি।

৪. তৎক্ষম শব্দে নামধাতুর প্রয়োগ ছিল। যেমন - সান্ত্বাইব, নমস্করিলা, নিমন্ত্রিয়া ইত্যাদি।

৫. প্রচুর পরিমানে আরবী, আর্সী, উর্কী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটল। যেমকন - লাল, হাওয়া, খিল, ওস্তাদ, দুষমন ইত্যাদি।

৬. বৈষ্ণব পদাবলীর ক্ষেত্রে ব্রজবুলি নামক কৃত্রিম কবিভাষার প্রচলন দেখা গেল।

আধুনিক বাংলা ভাষা

ধ্বনিগত

১. মধ্যযুগে লেখ্য ও কথ্য অর্থাৎসাধু ও চলিত ভাষার মধ্যে যে মিশ্রন দেখা যেত তার

মধ্যে আধুনিক যুগে প্রভেদ করা হলো। সাধু ও চলিত দুইটি স্বতন্ত্র গদ্যরীতির রূপলাভ করলো।

২. পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলের ভাষায় অপিনিহিতির পরিবর্তে সমীভবন প্রাধান্য পেল। যেমন - পাইয়া>পেয়ে, খাইয়া> খেয়ে।

৩. কথ্যভাষাব স্বর সংগতি দেখা দিল। যেমন - পটুয়া > পেটো, জলুয়া>জোলো ইত্যাদি।

রূপগত

১. সাধুভাষার যুক্ত ক্রিয়া পদের ব্যবহার ক্রমশ বাড়তে থাকলো। যেমন - দানকরা, গানকরা ইত্যাদি।

২. অসমাপিকার ক্ষেত্রে ইয়া-র বদলে পূর্বক শব্দের ব্যবহার দেখা গেল। যেমন - আগমন পূর্বক (আসিয়া), শ্রবণপূর্বক (শুনিয়া) ইত্যাদি।

৩. ফারসী Wa ('ব') এর মত বাংলায় সংযোজক রূপে 'ও' শব্দের ব্যবহার ও শুরু হলো। যেমন তুমি ও আমি, রাম ও রিম ইত্যাদি।

৪. মধ্যযুগের বাংলায় নঞর্থক 'ন' শব্দ বাক্যের আগে ব্যবহার করা হতো। যেমন ন জাইত। তার বদলে আধুনিক যুগের বাংলা নঞর্থক 'না' বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হতে থাকলো। যেমন - যেও না, করো না ইত্যাদি।

৫. সমাপিকা ক্রিয়ার বদলে অসমাপিকা ব্যবহার করে একাধিক বাক্যকে একটি বাক্যেব্যবহারের রীতি গৃহীত হলো। যেমন - রিমি ত্রিপুরা গেল। ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির দেখিল। মন্দির দেখিয়া মুগ্ধ হইল। বাক্যগুলি রিমি ত্রিপুরায় গিয়া ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দির দেখিয়া মুগ্ধ হইল - রূপে একবাক্যে গঠিত হলো।

৬. প্রচুর ইংরেজি শব্দ অধিকৃত ও বিবৃতভাবে বাংলায় ব্যবহৃত হতে থাকলেও। যেমন - চিয়ার (Chair), টেবিল (Table), লাইট (Light), ফ্যান (Fan), রেড়িও (Radio) ইত্যাদি।

৭. চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজের সীমা অতিক্রম করে গদ্যভাষা ও গদ্যরীতি প্রাধান্য পাওয়ায় গদ্যরীতির বদলে গদ্যরীতি সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠলো।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ধ্বনিপরিবর্তন

ভাষার মূল উপাদান হলো ধ্বনি। সমাজ ও ভাষা উভয়ই গতিশীল। তাই সমাজ পরিবর্তনের ফলে ভাষার অন্যতম উপাদান ধ্বনির পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ধ্বনি পরিবর্তনের অনেকগুলি কারণ রয়েছে। যেমন -

(১) ভোগলিক পরিবেশ ও জলবায়ুর প্রভাব।

(২) ভিন্ন ভাষার প্রভাব।

(৩) উচ্চারনের ত্রুটি, আরামপ্রিয়তা, অসাবধানতা।

(৪) শ্রবণ ও বোধের ত্রুটি।

(৫) সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব।

যে সমস্ত বহিরঙ্গ কারনে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে তা হলো -

(১) ধ্বনির আগম।

(২) ধ্বনির লোপ।

(৩) ধ্বনির রূপান্তর।

(৪) ধ্বনির বিপর্যয় বা বিপর্যাস।

ধ্বনির আগম

ধ্বনির আগম দুই ধরনের - (ক) স্বরধ্বনি আগম ও (খ) ব্যাঞ্জন ধ্বনির আগম। ধ্বনির অবস্থান তিন ধরনের, যথা - আদি, মধ্য ও অন্ত্য।

আদি স্বরাগম

সংযুক্ত ব্যাঞ্জনবর্ন শব্দের আদিতে থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য যখন উচ্চারিত শব্দের আগে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় তখন তাকে আদি স্বরাগম বললে। যেমন - স্কুল>ইস্কুল, স্ত্রী>ইস্ত্রি।

মধ্য স্বরাগম (বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি)

উচ্চারনের সুবিধার জন্য যখন যুক্তব্যঞ্জন বর্নের মধ্যে স্বরধ্বনির আবাস ঘটে

তখন তাকে মধ্যস্বরাগম বলে যেমন - ভক্তি > ভকতি, মুক্তি > মুকতি।

অন্ত্যস্বরাগম

শব্দের শেষে যখন স্বরধনির আগাম ঘটে তখন তাকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। যেমন - বেঞ্চ > বেঞ্চি, গিল্ট > গিল্টি।

ব্যাঞ্জনধ্বনির আগম

স্বরধনির আগমের মত ধ্বনির আগমের অবস্থান ভেদে ব্যাঞ্জন ধ্বনির ক্ষেত্রেও তেমনি আদি ব্যাঞ্জনাগম, মধ্যব্যঞ্জনাগম ও অন্ত্যব্যঞ্জনাগম লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ -

(ক) আদি ব্যাঞ্জনাগম - ঋজু > উজু, ওঝা > রোজা।

(খ) মধ্যব্যাঞ্জনাগম - শৃগাল > শিয়াল, বেয়ারা > বেহারা।

মধ্যব্যাঞ্জনাগম আবার শ্রুতিধ্বনি বলে উল্লেখ করা হয়। মধ্যব্যাঞ্জনাগম প্রক্রিয়ার মধ্যে যে জাঈয় শ্রুতিধ্বনির আগমন ঘটে তা হলো 'য়'-শ্রুতি, 'ধ'-শ্রুতি, 'ওয়'-শ্রুতি, 'দ'-শ্রুতি, 'ওর'-শ্রুতি। শ্রুতির আগমের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দের মধ্যে য়, ব, ওয়, দ, রু ধ্বনির আগম লক্ষ্য করা যায়। যেমন -

য় - শ্রুতি - লৌহ > লোহা > নোয়া, সাগর > সায়র।

ব - শ্রুতি - তামা > তাঁবা।

ওয় - শ্রতি - খা + ওয়া = খাওয়া।

হ - শ্রুতি - বিপুলা > বেহুলা, রাজকুল > রাহুল।

দ - শ্রুতি - আনর > বাঁদর, জেনারেল > জাঁদরেল।

ধ্বনির লোপ

ধ্বনির আগমের মত ধ্বনির লোপও দুই ধরনের, যেমন - স্বরধ্বনি লোপ ও ব্যাঞ্জনধ্বনি লোপ।

আদি স্বরলোপ - উদ্ধার > উধার > ধার, অলাবু > লাবু > লাউ।

অন্তস্বর লোপ - রাশি > রাশ, চিত্ত > চিত।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

আদি ব্যাঞ্জন লোপ - শ্মশান > মশান, স্থিত > থিতু।

মধ্যব্যঞ্জন লোপ - ফলাহার > ফলার

অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ - বড়দাদা > বডদা, বউদিদি > বউদি।

ধ্বনির রূপান্তর

ধ্বনির আগম বা লোপ ছাড়া ও ধ্বনি পরিবর্তন শব্দ মধ্যস্থিত ধ্বনির রূপান্তরের ফলে হতে পারে। সবর ও ব্যাঞ্জন উভয় রূপান্তরের ঘটতে পারে। স্বরধ্বনি রূপান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে স্বরাগম অভিশ্রুতি ইত্যাদি যেমন রয়েছে তেমি ব্যাঞ্জন ধ্বনির পরিবর্তনের ফলে সমীভবন, বিষমীভবন ইত্যাদি জাতীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

স্বরসঙ্গত

যেখানে শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি পারস্পারিক প্রভাবে একটি সামঞ্জস্য সৃষ্টি হয় তখন তাকে স্বরসঙ্গতি বলে। যেমন - দেশি > দিশি, বিলাতি > বিলিতি।

অভিশ্রুতি

শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' ধ্বনি উচ্চারিত হলে তাকে অপিনিহিত বলে। শব্দের মধ্যবর্তী 'ই' বা 'উ' ধ্বনিপাশের স্বরধ্বনিকেপ্রভাবিত করলে তাকে অভিশ্রতি বলে। ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অপিনিহিতির পরের স্তর লো অভিশ্রুতি। যেমন - করিয়া > কইর্‌্যা > করে, বানিয়া > বান্যা > বেনে।

সমীভবন

শব্দের মধ্যে দু'টি বাঞ্জনধ্বনি একে অন্যকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করলে সেখানে সমীভবন হয়। সমীভবন তিন ধরনের। প্রগত, পরাগত, আলচ্য। শব্দের পূর্ববর্তী ব্যাঞ্জনধ্বনিরপ্রভাবে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটলে তাকে প্রগতসমীভবন বলে। যেমন -পক্ক > পক্ক, পদ্ম > পদ্দ। শব্দের অন্তর্গত পরবর্তী ব্যাঞ্জনধ্বনি যদি পূর্ববর্তী ব্যাঞ্জন ধ্বনিকে পরিবর্তিত করে তবে সেখানে পরাগত সমীভবন হয়। যেমন - গল্প - গপ্প, পোতদার < পোদ্দার। শব্দের অন্তর্গত সন্নিহিত বা পাশাপাশি অবস্থিত দুটিব্যাঞ্জনধ্বনি পরস্পরকে প্রভাবিত করায় যদিউভয়েরই পরিবর্তন ঘটে সেখানে অন্যোন্য সমীভন হয়। যেমন - উৎ+শ্বাস > উচ্ছাস, বৎসর > বচ্ছর।

বিষমীভবন

সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়াকে বলে বিষমীভবন। শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দুটিসমধ্বনির মধ্যে একটির পরিবর্তন ঘটলে তাকে বিষমীভবন বলা হয়। যেমন - লেবু>নেবু, লুচি>নুচি।

অপিনিহিত

শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' ধ্বনি উচ্চারনের রিতিকে অপিনিহিতি বললে। অভিশ্রুতির পূর্বস্তর অপিনিহিতির মধ্যে দেখা যায়। যেমন - নাচিয়া>নাইচ্যা, দেখিয়া>দেইখ্যা। শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনির আগমন প্রক্রিয়াকে আবার বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি নামে উধল্লেখ করা হয়। যেমন - বাক্য>বাইক্ক, সত্য>সইত্য।

ঘোষীভবন

শব্দের অন্তর্গত অঘোষধ্বনি সঘোষ ভাবে উচ্চারিত হলে তাকে ঘোষী ভবন বলে। যেমন চাকরি> কাগরি, ছাত>ছাদ।

অঘোষিভবন

ঘোষিভবনের বিপরীত ঘটলে অঘোষিভবন হয়। অর্থাৎ সঘোষীধ্বনি তখন অঘোষ রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন পার্সী খারাব>বাং খারাপ, বড়ঠাকুর>চট্টঠাকুর।

মহাপ্রাণীভবন

মহাপ্রানধ্বনিরপ্রভাবে শব্দের মধ্যে অবস্থিত অল্পপ্রানধ্বনি মহাপ্রণ ধ্বনির মত উচ্চারিত হলে তাকে মহাপ্রাণীভবন বলে। যেমন - পুস্তিকা> পুথি, পাশ>ফাঁস।

অল্পপ্রাণীভবন

এই প্রক্রিয়াটি মহাপ্রাণীভবনের বিপরীতে। মহাপ্রাণধ্বনি অল্পপ্রাণের মত উচ্চারিত হলে তখন অল্প প্রাণীভবন হয়। যেমন - দুধ>দুদ, বাঘ>বাগ।

ধ্বনির স্থানান্তর বা বিপর্যাস

শব্দের মধ্যস্থিত কাছাকাছি বা সংযুক্ত দুটি ধ্বনি যদিনিজেদের মধ্যে স্থান পরিবর্তন করে তাহলে বিপর্যস বা বর্ণিপর্যয় বলে। যেমন - বাতাসা > বাসাতা, বাক্স >

টিপ্পনী

বাস্ক।

দূরস্থধ্বনির বিপর্যাস

শব্দের মত বাক্যের মধ্যে দূরে অস্থিত দুটি ধ্বনি যদিস্থান পরিবর্তন করে তাহললে তাকে দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস বলে। যেমন - এক কাপ চা > আক চাপ কা।

টিপ্পনী

প্রান্তবিশ্লেষ

শব্দের প্রকৃত অর্থ না জানার জন্য অনেক সময় শব্দটি ভ্রান্ত বিশ্লেষণের ফলে যে সব নতুন শব্দ গড়ে ওঠে তাকে প্রান্ত বিশ্লেষ বলে। যেমন - মেসেজ > ম্যাসেজ, মিরাকেল>মিরাক্কেল।

(খ)

সমাজ ভাষা বিজ্ঞান

ভাষাবিজ্ঞানের মূল আলোচ্য বিষয় হলো ভাষার ব্যাকরণ। তাকে কেন্দ্রীয় ভাষা বিজ্ঞান বলে উল্লেখ করা যায়। নানা বৈজ্ঞানিক বিষয় ও ভাষা বিজ্ঞানের মিশ্রনে ভাষা বিজ্ঞানের যে সমস্ত বহিরঙ্গ রূপগড়ে ওঠে তার অন্যতম আলোচ্য বিষয় হলো সমাজ ভাষা বিজ্ঞান (Social Lingnistics) । তাই সমাজ ভাষা বিজ্ঞান বলতে ভাষা বিজ্ঞানের এক বহিরঙ্গ আলোচ্য বিষয়ের কথা ভাষা বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন। তাঁদের অভিমত হলো সমাজ বিজ্ঞানীদের ভাষা সম্পর্কিত আলোচনার ক্ষেত্রকে বলে ভাষার সমাজতত্ত্ব কিন্তু ভাষা বিজ্ঞানীরা যখন সামাজিক ভাষা নিয়ে আলচোনা করেন তখন তা সমাজভাষা বিজ্ঞান বলে স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে Haver C. Currier প্রথম Social Lingustics কথাটি ব্যবহার করেন। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক রাজীব হুমায়ুন সমাজভাষা বিজ্ঞান গ্রন্থে জানিয়েছেন, 'শ্যারিয়েল স্যাভিলট্রাইকের মতে, সব চাইতে পুরনো সমাজ ভাষা তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মহান লাভ করা যায়, জে.বি.হোয়াইটের রচনায়। ১৮৮০ সালে তিনি আপাচে অভিনন্দন রীতি নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯১৫ থেকে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পাশ্চাত্যে এডওয়ার্ড সাপির, ম্যালিনোভস্কি, ম্যাকডেভিড, ফার্থ প্রমুখ সমাজভাষা বিজ্ঞান নিয়ে নানা প্রবন্ধ রচনা করেন ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কে

প্রথম আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে সমাজভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কে একটি ধারনা ও সে সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্র নির্মান বিষয়ে জোর দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকশিত Social linguistis গ্রন্থে Hudson প্রথম সমাজভাষা বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়ে সমাজের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অনুযায়ী ভাষা অধ্যায়নকে সমাজভাষা বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছিলেন। তিনি কভাষার সমাজতত্ত্ব ও সমাজভাষা বিজ্ঞানকে পৃথকভাবে দেখতে চাননি।

টিপ্পনী

Fisherman ভাষার সমাজতত্ত্বকে গুরুত্বপূর্ন বলে মনে করেছেন। ভাষার সমাজতত্ত্বকে তিনভাগে বিভক্ত করেন। এই তিনটি ভাগ হলো - ১. বর্ণনামূলক, ২. গতিশীল, ৩. প্রয়োগমূলক। অন্য আর একজন ভাষাবিজ্ঞানী ব্রাইট সমাজ ভাষাবিজ্ঞান বলতে Linguistics diversity' বা ভাষাতত্ত্বগত বিভিন্নতাকে বোঝাতে চেয়েছেন।

সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রগুলি নিয়ে বিভিন্ন গবেষক ও সমালোচক ভিন্নমত পোষণ করে থাকেন।

বর্ণনামূলক ভাষা বিজ্ঞান

বর্ণনামুলক ভাষা বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে ব্রাইট ও ফিসারম্যানের তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন । বর্ণানামূলক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কে, কাকে, কোন ভাষায় কোন পরিবেশে কোন উপলক্ষের বলেছেন তা বিচার করা কথোপকথোনের ক্ষেত্রে তিনটি প্রধান উপাদান হলো বক্তা-শ্রোতা এবং উপলক্ষ্য। সামাজিক ভাষা বিজ্ঞানে এই তিনটি বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়। প্রাথমিকভাবে কথোপকথোনের ক্ষেত্রে নানা পার্থক্য এই তিনটি উপাদানের উপর নির্ভরশীল।

রাইট, ফিসম্যান, ডেল হাইমস, ব্রাইট সবাই বক্তা, প্রেরক বা কর্তা প্রেরকের কথা বলেছেন। বক্তার শিক্ষাদীক্ষা, জীবিকা, বয়স, লিঙ্গভেদ, জাতিগত ওঅর্থনৈতিক অবস্থা সমাজভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতন্ত জরুরি বলে মনে করা হয়। তার উপরে নির্ভর করে সমাজ উপভাষা গড়ে ওঠে। শ্রোতা হলো গ্রাহক বা যার উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরণ করা হয়েছে। শ্রোতার ব্যাক্তি পরিচয়ের উপর ভাষার রূপ নির্ভর করে। দৈনন্দিন জীবনে আমরা পারিবারিক জীবনে, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতে যে ভাষা ব্যবহার তার মধ্যে নানা ভেদ লক্ষ্য করা যায়। তাই বক্তা-শ্রোতার পরিচয় এক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন।

টিপ্পনী

ফিসারম্যান Settning বা উপলক্ষের কথা বলেচেন। বক্তা বা শ্রোতা ছাড়া কোন উপলক্ষে কথা বলা হচ্ছে তা জানাটাও অত্যন্ত জরুরী। ইংরেজ ভাষাবিজ্ঞানীরা উপলক্ষ অনুযায়ী ভাষার রুপ বদলকে রেজিষ্টার বলে উল্লেখ করেছেন। পরিবেশ পরিস্থিতি বা উপলক্ষ্য ভেদে ভাষারীতির যে রদবদল ঘটে তাকে বলা হয় Lodematching বা সংকেত বদল।

গতিশীল সমাজ ভাষা বিজ্ঞান

Fisherman Dianamic linguistics এর ড. পবিত্র সরকার নাম দিয়েছেন। সচল বা বিবর্তমান সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোচনা করা হয়। Fisherman ব্যাক্তিকে অবলম্বন করে সমাজভাষার বিবর্তনের কথা বলেছেন। তিনি স্থিতিশীল ও অস্থিতিশীল দুই ধরনের দ্বিভাষিকতা লক্ষ্য করেছেন। ফিসম্যান domain বা এলাকা পরিভাষার সাহায্যে স্থিতিশীল দ্বিভাষি সমাজও অস্থিতিশীল দ্বিভাষী সমাজ বলে একটি ভেদরেখা টানতে চেয়েছেন। স্থিতিশীল সমাজে দুটি ভাষাকে সমান্তরাল ভাবে ব্যবহার করা হয়। অস্থিতিশীল সমাজে ভাষা ব্যবহার তেমন সুশৃঙ্খল নয় - মাতৃভাষা ও অন্যএকটি ভাষা সেখানে প্রয়োজন মত পাশাপাশি ব্যবহার করা হয়। ক্লস দু-রকমের দ্বিভাষিকতা কথা বলেছে। অন্তদ্বিভাষিকতার ক্ষেত্রটি হল Sitnation shifting বা Code Swritching এর ক্ষেত্র বিশেষ। অবস্থা অনুযায়ী মানুষকে এক ভাষা বৈচিত্র থেকে অন্যভাষা বৈচিত্রের দিকে এগিয়ে যেতে হয়। বহুভাষাভাষী দেশে প্রায়ই এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করা যায়। একে বহুভাষিক বা দ্বিভাষিক বলে। নানা কারনে বদলে যাওয়ার জন্য ব্রাইট সমাজভাষা বিজ্ঞান বলে মনে করেছেন।

প্রয়োগমূলক সমাজ ভাষাবিজ্ঞান

Fisherman যাকে প্রয়োগমূলক ভাষার সমাজতত্ত্ব বলে উল্লেখ করেছেন তাকে Bright Application নামে অভিহিত করেছেন। ভাষার লক্ষণ, জাতিভেদ শ্রেনিভেদ ইত্যাদির সাহায্যে ব্রাইট ভাষার বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের কথা বলেছেন। এই ব্যাপারটি সামাজিক বাঐতিহাসিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে বিচার করা যেতে পারে। একটি সামাজিকপরিবেশে ভাষা বলে যায় কিনা, ভাষার অন্তর্গত সমাজভাষার পরিবর্তন ঘটে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখা প্রয়োগমূলক ভাষা বিজ্ঞানের কাজ। ব্রাইট পরিবর্তনের দিকগুলি খুঁজে দেখার কথা বলেছেন আর ফিসম্যান বলেছেন তার পরিকল্পিত

প্রয়োগের দিকের কথা। আধুনিক সমাজ ভাষা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা শেখানো তার পাশাপাশি অন্যভাষা বোঝানে, অনুবাদ দক্ষতা বাড়ানো, লিপি ও বানান সম্পর্কে ধারনা সৃষ্টি ইত্যাদি প্রয়োগমূলক ভাষা পরিকল্পনা বা Language Planning বলেগ্রহ করা হয়।

টিপ্পনী

শৈলীবিজ্ঞান

ইংরেজী 'স্টাইলিস্টিক' শব্দের অনুসরণে বাংলায় আধুনিক যুগে সাহিত্য চর্চার নতুন পদ্ধতি হিসেবে 'শৈলীবিজ্ঞান' শব্দটি যধেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছে। ইংরেজি 'স্টাইলস্টক' শব্দ সাহিত্যশৈলীর বিজ্ঞান ভিত্তিক আলোচনা রূপে গৃহীত হয়েছে। সাহিত্যশৈলীর বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ফরাসী ভাষায় La Stylistique এবং জার্মান ভাষায় Die stylistik বললা হয়। কোনো কোনো সমালোচক ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে কথিত রীতি ও Style শব্দটিকে সমার্থক বলে মনে করলেও তা ঠিক নয়। ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে গৌড়ী, মাগধী, দাক্ষিনাত্য ইত্যাদি রীতির মধ্যে বিশেষ অঞ্চলে গড়ে ওঠা বহিরঙ্গ যে সমস্ত রানাপদ্ধতির কথা বলেছেন তা বস্তুগত। কিন্তু পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতির অনুসরণে যাকে শৈলী বলা হয়ে থাকে তা নিতান্তই লেখকের ব্যাক্তিগত রচনারীতির বৈশিষ্ট্যকে সূচীত করে থাকে।

সাহিত্য সৃষ্টিরপ্রধান উপকরণ ভাষা। তাই ভাষার উপরনির্ভর করে বিজ্ঞান ভিত্তিক সমালোচনার আধুনিক পদ্ধতিকে শৈলীবিজ্ঞান নামে অভিহিত করা হয়েছে। শৈলী বিজ্ঞান তাই ভাষাবিজ্ঞান চর্চার স্বতন্ত্র ক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। পুরাতন যুগের সাহিত্য সমালোচনা পদ্ধতির সঙ্গে শৈলী বিজ্ঞানের পার্থক্য নির্নয় করতে গিয়ে বলা যায় পুরাতন প্রচলিত পদ্ধতিতে মন্ময় সমালোচকের রসগ্রহিতা সেখানে প্রাধান্য পেত ল কিন্তু শৈলী বিচারের ক্ষেত্রে তন্ময় দৃষ্টিভঙ্গিকেপ্রাধান্য দেওয়া হয়। শৈলীবিজ্ঞানের বিচারেস্রষ্টার ব্যাক্তি শৈলী বা যুগশৈলী এর বৈশিষ্ট্য নির্নয় করতে গিয়ে ব্যাক্তি হিসেবে স্রষ্টার বা কালের প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর রচনায় যুগ মানসের প্রতিফলনকে বিদার্ঘ বিষয় রূপে গ্রহন করা হয়। বাক্তি শৈলীর ক্ষেত্রে ব্যাক্তির রুচি-সংস্থৃতি-আদর্শবোধকে যেমন বিচার করা হয় তেমনি যুগেরআর্থ-সমাজিক প্রেক্ষাপটে স্রষ্টার সৃষ্টিতে শব্দব্যবহার, পদবিন্যাস, রূপক-প্রতিখ সংকেতের ব্যবহার ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে রচনারীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা শৈলী বিজ্ঞানের উদ্দীষ্ট। এই ধরনের সমালোচনায় সমাজ

টিপ্পনী

ভাষা বিজ্ঞান, মনস্তাত্ত্বিক ভাষাবিজ্ঞান ইত্যাদির সঙ্গে পরিসংখ্যান পদ্ধতি, ছক, সারনী ব্যবহারের ফলে তা অত্যন্ত জ্ঞানভিত্তিক হয়ে উঠেছে। সেখানে সমালোচকের ব্যাক্তিগত রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির বদলে বস্তুভিত্তিক নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। তাই এই জাতীয় সমালোচনা পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য সমর্থকে আলোচনা করতে গিয়ে বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্বিদ গ্রাহাম হাফ যুগমানস (The mind of an age) ও স্রষ্টার সামগ্রিক সৃজনশীল প্রেরনা (Whole creative impnlse) র কথা বলেছেন।

শৈলী বিচারের ক্ষেত্রে ধ্বনিবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী ধ্বনিগত, রূপগত, শব্দার্থগত দিকগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। শৈলী বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শব্দের ধ্বনিগত দিকটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হয়। তাই সেখানে শব্দদ্বৈত, ধ্বনিত্মক ধ্বনি ইত্যাদি ব্যবহারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়। বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে বিন্যাস, কর্তা - কর্ম - ক্রিয়াপদের ব্যবহার, সর্বনামের ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাক্তি ও যুগ শৈলীকে প্রাধান্য শৈলীবিজ্ঞান লক্ষ্য করা যায়।

(গ)

আন্তর্জাতিক ধ্বনি বর্ণমালা I.P.A

উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে বর্ণমালার সামঞ্জস্য সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক ধ্বনিমালার উদ্ভব ও উল্লেখ ঘটেছে। বিদেশিদের কাছে ভাষার শুদ্ধ উচ্চারনের জন্য যেমন আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালার প্রয়োজন, তেমনি স্বদেশী ভাষার ধ্বনি ও লিপিগত রূপের বৈষম্যদূর করার ক্ষেত্রেও তার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে।

আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা রোমীয় বর্ণমালা উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও কোথায় সামান্য পার্থক্য দেখা যায়। তাই লিপ্যন্তরের আগে বর্ণমালাগুলির সঙ্গে পরিচয় থাকা প্রয়োজন। নীচে বাংলা বর্ণের সঙ্গে রোমীয় লিপি ও IPA এর রূপ দেওয়া হল।

বাংলা বর্ণমালা ও উচ্চারন অনুযায়ী তার রোমীয় লিপি এবং আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা (IPA)

বাংলা বর্ণ	রোমীয় লিপি	IPA
অ	a	ɔ
আ	ā	a
ই	i	I
ঈ (উচ্চারণ ‘ই’ এর মতো)	ī	I
উ	u	u
ঊ (উচ্চারণ ‘উ’ এর মতো)	ū	u
ঋ (উচ্চারণ ‘রি’ এর মতো)	r	ri
এ	e/e	e
ঐ (উচ্চারণ ‘ওই’)	oi/ai	oi
ও	o/o̲	o
ঔ (উচ্চারণ ‘ওউ’)	ou/au	ou
অ্যা		æ
ক্	k	k
খ্	kh	k^h
গ্	g	g
ঘ্	gh	g^h
ঙ্	ṅ	s
চ্	c	c
ছ্	ch	c^h
জ্	j	s
ঝ্	jh	
ঞ (প্রকৃত উচ্চারন নেই। প্রধানত ‘ন’ উচ্চারিত হয়)	ñ	n
ট্	t	ʈ

টিপ্পনী

টিপ্পনী

বাংলা বর্ণ	রোমীয় লিপি	IPA
ঠ	th	t^h
ড়	d	ɖ
ঢ়	dh	$ɖ^h$
ণ	n	n
(উচ্চারণ - 'ন' এর মতো)		
ত্	t	t
থ্	th	t^h
দ্	d	d
ধ্	dh	d^h
ন্	n	n
প্	p	p
ফ্	ph	p^h
ব্	b	b
ভ্	bh	b^h
ম্	m	m
য্	y / j	
(উচ্চারণ 'জ' এর মতো)		
র	r	r
ল্	l	l
শ	s	ʃ
ষ	s	ʃ
(উচ্চারণ 'শ' এর মতো)		
স	s	ʃ
হ	h	h
ড়	d / r	ɽ
ঢ়	dh / rh	ɽ
(উচ্চারন 'ড়' -এর মতো)		
য়	y	e̯
ব/ওয়	b/v/w	
ং	n / m	ŋ
ঃ	h / h	h

IPA লিপি না চিনলে লিখ্যন্তর সম্ভব নয় বলে শিক্ষার্থিদের আগে তা চিনে নিতে হবে।

লিখ্যান্তরের কয়েকটি সাধারণ নিয়ম

১. প্রতিটি মূলধ্বনির জন্য পৃথকভাবে একটি মাত্র বর্ণ বভবহার করতে হবে।

২. ভাষার লিখিত রূপ নয় প্রকৃত উচ্চারন অনুসারে ধ্বনিমূলক লিপি ব্যবআর করতে হবে। যেমন ভাষার লিখিত রূপে আমরা এমন, এখন ইত্যাদি লিখি কিন্তু উচ্চারিত ধ্বনিগুলি অ্যামন, অ্যাখন হয়। তাই লিপ্যন্তরের সময় উচ্চারিত ধ্বনির জন্যই ধ্বনিমূলক লিপি ব্যবহার করে হবে।

৩. IPA বর্ণমালায় বড়হরফে (Capital letter) ব্যবহার করা হয় না লিপ্যন্তরের সময় ছোট হরফ সর্বত্র ব্যবহার করতেহবে।

৪. আন্তর্জাতিক ধ্বনি লিখিরশুরু ও শেষে (/) তির্যক রেখা (Slash, Storke) ব্যবহার করতে হয়।

৫. নামপদের আগে *(তারকা চিহ্ন) ব্যবহার করতে হয়। যেমন - রবীন্দ্রনাথ হবে*/rabindronat^{h}/

৬. সানুনাসিকধ্বনির স্বরবর্ণের মাথারউপরে [~] চিহ্ন যুক্ত করতে হবে।
যেমন - পাঁচ = /pa͂nc/

৭. যৌগিক স্বর বোঝানোর জন্য ‘ ’ চিহ্ন ব্যবহার করতে হয়।
যেমন - উ /ou/

লিপ্যন্তরের কয়েকটি নমুনা

বাংলা শব্দ	রোমীয় বর্নান্তর	IPA - তে রূপান্তর
রামমোহন	র্+আ+ম্+ম্+ও+ই্+অ+ন্ = Rammohan	রামমোহন =র্+আ+ম্+ম্+ও+হ্+অ +ন্ = */rammohan/

টিপ্পনী

বাংলা শব্দ	রোমীয় বর্নান্তর	IPA - তে রূপান্তর
কৃষ্ণচন্দ্র	ক্+ঋ+ষ্+ণ্+অ+চ্+অ +ন্+দ্+র+অ =Krisnacandra	কৃশ্নোচন্দ্রো =ক্+ঋ+শ্+ণ্+ও+চ্+অ +ন্+দ্+র+ও = */kriʃnocdndro/

অনুচ্ছেদের লিখ্যন্তর

আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবংসাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেচে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত - যাঁরা লোকহিতায় এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পান্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু কটমট ভাষা - যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিতমাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পান্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না?

amader deʃe pracin kal t^{h}eke ʃɔŋɔʃkrito ʃomoʃto bidda t^{h}akar dorun, biddan ebɔŋ ʃadharɔner modd^{h}e kʈa ɔpar ʃomuddro dɑ̃ɽie g. *budd^{h}a t^{h}eke *cɔitɔnno *ramkriʃno porɔnto -ʒɑ̃ra lokhita eʃec^{h}en, tɑ̃ra ʃɔkolei ʃad^{h}aron loker b^{h}aʃa ʃad^{h}aronke ʃikk^{h}a di ec^{h}en. panditto ɔboʃʃo utkriʃʈo, kintu kɔʈomɔʈo bhaa - ʒa ɔprakritik, kolpito mattro, tate c^{h}aɽa ki ar panditto hɔe̯ na ? cɔlit b^{h}aʃa ki ar ʃilponɔipunno hɔe̯ na?

আত্মমূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন

১. ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের পরিচয় দিন।

২. বাক্যতত্ত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩. ঐতিহাসিক ও বর্ণনামূলক ভাষাবিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪. ইন্দো-ইরানীর ভাষাবংশের পরিচয় দিন।

৫. বাংলা ভাষা অন্-আর্য প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. সমাজ ভাষা বিজ্ঞান বলতে কি বোঝায় সংক্ষেপে লিখুন।

৭. শৈলীবিজ্ঞানের বিশেষত্বের পরিচয় দিন।

৮. ধ্বনি পরিবর্তনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ করুন।

৯. ধ্বনি পরিবর্তনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিন।

১০. বাংলা ভাষার তিনটি যুগের কালসীমার পরিচয় দিন।

টিপ্পনী

উত্তর লিখে পাঠানোর জন্য প্রশ্নাবলী

১. ধ্বনিবিজ্ঞান কিসের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তা আলোচনা করুন।

২. সংবর্তনী-সজ্ঞননী তত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার পরিচয় দিন।

৪. প্রাচিন বাংল, মধ্যবংলা অথবা আধুনিক বাংলার যে কোনো একটির ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫. শব্দার্থ পরিবর্তনের কারণ ও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬. সমাজভাষা বিজ্ঞান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. "সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গলা ব্যকরণ" - ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

২. "বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ই ইতিকথা" - ড. দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু

৩. "সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা" - ড. রামেশ্বর শ

৪. "প্রসঙ্গ : বাংলাভাষা" - ড. সুখেন বিশ্বাস

৫. "বাংলা ভাষাতত্ত্ব" - ড. কৃষ্ণগোপাল রায়

৬. "ভাষার ইতিবৃত্ত্ব" - ড. সুকুমার সেন

৭. ভাষা - দেশ - কাল - ড. পবিত্র সরকার

৮. নোয়াম চমস্কির ভাষা তত্ত্ব - ড. পবিত্র সরকার
৯. শৈলীবিজ্ঞান - ড. অপূর্বকুমার রায়

টিপ্পনী

তৃতীয় একক

স্বনিম তত্ত্ব

মূলধ্বনি বা স্বনিম (Phonecme)

টিপ্পনী

ইংরেজী Sound এর বাংলায় ধ্বনি শব্দটি ব্যাপক অর্থ বহন করে। ধ্বনি বিভিন্ন ভাবে সৃষ্টি হতে পারে। যেমন যন্ত্রের সাহায্য, হাততালির মাধ্যমে বা মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে। এইসব রকমের ধ্বনিকে আমরা 'Sound' বা ধ্বনি বলি। তবে এরমধ্যে থেকে কেবলমাত্র মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনিকেই স্বন বা বাগ্‌ধারা (Phone) বলে। বাগযন্ত্রের সাহায্যে সৃষ্টি সব ধ্বনি অন্বয় ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। যেমন - পাগলের অর্থহীন প্রলাপ বা শিশুর অস্ফুষ্ট ধ্বনি। শুধু মাত্র মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত এবং ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনির মধ্যে কিছু ধ্বনি হল মূলধ্বনি। আর কিছু হল মূলধ্বনির উচ্চারণ বৈচিত্র।

আধুনিক বাংলাভাষায় 'শ্লীল' শব্দে 'শ' এর উচ্চারণ দন্ত্য 'স' এর মতো কিন্তু 'শীল' শব্দে 'শ' এর উচ্চারণ তালব্য 'শ' ই।

এখানে মূলধ্বনি একটাই সেটি হল - 'শ'।

কিন্তু বাংলায় আর দুটো উচ্চারন বৈচিত্র কখনো দন্ত্য 'স' এর মতো অথবা ককনো 'শ' ই।

অতএব দেখা গেল ভাষায় কিছু মূলধ্বনিকে এবং তাদের আবার একাধিক উচ্চারণ ঐচিত্র্য সহ প্রত্যেকটি মূলধ্বনিকেই বলে স্বনিম (বা ধ্বনিতা বা ধ্বনিমান বা ধ্বনিমূল) (Phoneme)।

মূলধ্বনির উচ্চারন বৈচিত্র্য দুরকম হতে পারে -

(ক) উপধ্বনি (বা পূরকধ্বনি বা সহধ্বনি বা বিস্বন) (Allophone)

(খ) মুক্ত বেচিত্র্য বা স্বচ্চন্দ বৈচিত্র্য (Force Variation)

এই মূলধ্বনি বা স্বনিমই হল ভাষার মল উপাদান।স্বনিমের তত্ত্ব প্রথ বাখ্যা করেন পোলিশ ভাষা বিজ্ঞানী জন বোদুঁঅ্যা দ্য কুর্তনে (Jan baudouim de

টিপ্পনী

courtenay) (1845 - 1929) তিনি বাগধ্বনি ও স্বনিমের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়ে রুশীয় ভাষায় 'Fonema' শব্দটি প্রথম প্রয়োগ করেন। আধুনিক বর্ণনামুলক ভাষাবিজ্ঞানের জনক ফেদিনাঁ দ্যা সোস্যুর Phoneme শব্দটি প্রয়োগ করেন ল এবং তখন থেকেই পাশ্চাত্যে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানি বিভিন্ন দৃষ্টি কোন থেকে 'Phoneme' এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে আসছেন।

স্বনিমের সহজতর ব্যাখ্যা করেছেন ভাষা বিজ্ঞানী প্রিন্স ক্রুবেৎস কয় - "A phoneme is a phonological unit which can not be broken down into any smaller phonological units . by phonemic units should be understood each member of a phonemic contrast. A Phonemic contrast is any sound contrast which, in the language in question can be used as a means of differentiating intellectual meaning." [সাধারন ভাষাবিজ্ঞানও বাংলা ভাষা - রমেশ্বর শ, পৃ : ২৭৬] অর্থাৎ,যে সব ক্ষুদ্রতম ধ্বনিগত এককের মধ্যে পারস্পারিক স্বনিসীয় বা মূলধ্বনিগত বিরোধ থাকে সেই ধ্বনিগত এককগুলির প্রত্যেকটিকে ধ্বনিতা বা স্বনিম (Phoneme) বলে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক -

কাল = ক্ + অ + ল্ = ক্ + আ + ল

খাল = খ্ + আ + ল্ = খ্ + আ + ল্

পার্থক্য সাদৃশ্য

'কাল' এবং 'খাল' শব্দদুটি 'ক' ও 'খ' কে বাদ দিলে আর কোন ধ্বনির ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য নেই অর্থাৎ আর সবই হুবহু এক। তাহলে দেখা যাচ্চে 'ক' ও 'খ' এরজন্য শব্দ দুটিতে অর্থের পার্থক্য হচ্ছে। এই রকম যে নূনতম ধ্বনির পার্থক্যের জন্যে একাধিক শব্দের মধ্যে অর্থের পার্থক্য হয় সেই ধ্বনি গুলিকে স্বনিম বা মূলধ্বনি (Phoneme) বলে।

উপরের উদাহরণ অনুযায়ী 'ক' এবং 'খ' হল দুটি স্বনিম বা মূলধ্বনি।

উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি বা সহধ্বনি বা বিস্বম (Allophone)

যে ধবনি অন্যধ্বনির সঙ্গে এমন পরিপূরক অবস্থানে থাকে যে ধ্বনি দুটি মিলিয়ে

একটি ধ্বনিতা বা স্বনিমগঠিত হয় সেই ধ্বনি দুটিকে উপধ্বনি বা পূরকধ্বনি বা বিস্বম (Allophone) বলে। যেমন 'স্ত্রী' শব্দের বানানে তালব্যশ লেখা থাকলেও 'র' এর সঙ্গে সংযোগের ফলে এখানে 'শ' এর স্থানে দন্ত্য 'স' উচ্চারিত হয়। কিন্তু 'শীল' শব্দে তালব্য 'শ' ই উচ্চারিত হয়। 'শ্রী' শব্দে তাল্য 'শ' ও শীল শব্দে দন্ত্য 'স' উচ্চারিত হতে পারে না। জোর করে উচ্চারন করলে তা খাঁটি বাংলা উচ্চারনই হয় না। এই কথাটি ভাষাবিজ্ঞানী গ্লীসন ব্যাখ্যা করে বলেছেন - "একাধিক ধ্বনির মধ্যে একটি যখন অন্যটির অবস্থান বা পরিবেশে বসতে না পারে তখন ধ্বনি গুলিকে পরিপূরক অবস্থানে বা প্রতিযোগী অবস্থানে রয়েছে বলা হয়।" তাই এখানে 'শ' ও 'স' হল পূরকধ্বনি বা বিস্ন।

টিপ্পনী

মুক্তবৈচিত্র্য বা স্বচ্ছন্দ বৈচিত্র্য (Free Variation)

যখন প্রায় সমোচ্চারিত দুটি ধ্বনি স্বনিম হওয়ার জন্যে প্রয়োজনীয় দুটি শর্ত পুরণ করে না, পরিপুরক অবস্থানেও থাকে না, একটির স্থানে অন্যটি বক্তার খেয়াল খুশি অনুসারে উচ্চারিত হয় তখন তাদের একই স্বনিমের মুক্ত বৈচিত্র্য (Free Variation) রূপে গ্রহন করা হয়।

স্বনিম হওয়ার প্রয়োজনীয় দুটি শর্ত হল -

১. শব্দ দুটি সুস্পষ্ট স্বতন্ত্র উচ্চারন। এবং

২. শব্দ দুটির মধ্যে অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি করার ক্ষমতা।

ব্যাঞ্জন স্বনিম

বাংলা ধ্বনির দুটি প্রধান বিভাগ হল -

ক. বিভাজ্যধ্বনি (SegmentalSound) ho

খ. অবিভাজ্য ধ্বনি(Supra- Segmental Sound)।

স্বনিমকেও দুইভাগে ভাগ করা যেতে পারে -

ক. বিভাজ্য স্বনিম

খ. অবিভাজ্য স্বনিম

টিপ্পনী

বিভাজ্য স্বনিমের অন্তর্গত ব্যঞ্জনস্বনিম

বাংলা ভাষায় শিষ্ট কথ্যরূপে নিম্নোক্ত ব্যঞ্জন স্বনিম সম্ভবপর-

স্পর্শধ্বনি ও সৃষ্টধ্বনি

পাল	প্	(১)
ফাল	ফ্	(২)
বট	ব্	(৩)
ভট	ভ্	(৪)
তান	ত্	(৫)
থান	থ্	(৬)
দান	দ্	(৭)
ধান	ধ্	(৮)
টক	ট	(৯)
ঠক	ঠ	(১০)
ভক	ভ	(১১)
ঢক	ঢ	(১২)
চাল	চ	(১৩)
ছাল	ছ	(১৪)
জাল	জ	(১৫
ঝাল	ঝ	(১৬)
কোল	ক	(১৭)
খোল	খ	(১৮)
গোল	গ	(১৯)
ঘোল	ঘ	(২০)

নাসিক্য ধ্বনি

হিম	ম	(২১)
হীন	ন	(২২)
হিং	ঙ	(২৩)

কম্পিত ও পার্শ্বিক ধ্বনি

রাশ	র	(২৪
লাশ	ল	(২৫)

উষ্ম ধ্বনি

শাল	শ	(২৬)
হাল	হ	(২৭)

কম্পিত ও তাড়িত ধ্বনি

হার	র	
হাড়	ড়	(২৮)

নৈকট্য ধ্বনি : অর্ধসর

ছায়া	য়	(২৯)
ছাওয়া	ওয়	(৩০)

বাংলা লিপিমালায় কতকগুলি বর্ণের স্বতন্ত্র ধ্বনিতা গৌরব নেই -

ঞ (=ন); ণ (=ন), ষ ও স (=শ), ঢ় (=ঢ), য (=জ)

ভাষা তাত্ত্বিক ড. সুনিতি কুমার স্/s ধ্বনিটিকে স্বতন্ত্র স্বনিম রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন।

বাংলা স্বর স্বনিম

বাংলা স্বরস্বনিম গুলিকে এভাবে শব্দ জোড়ের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে -

টিপ্পনী

টিপ্পনী

খল	অ	(১)
খাল	আ	(২)
খিল	ই	(৩)
খেল	এ	(৪)
খ্যাল	অ্যা	(৫)
খোল	ও	(৬)
খুল	উ	(৭)

এছাড়া অনুনাসিকা বা সানুনাসিক স্বরধ্বনি যোগে শব্দার্থ পরিবর্তিত হয় বলে সানুনাসিক স্বরধ্বনিগুলির পৃথক স্বনিম বা ধ্বনিতা মূল্য আছে।

সানুনাসিকা বা অনুনাসিক স্বর স্বনিম

বিধি	ই	(১)
বিঁধি	ইঁ	(২)
এরা	এ	(৩)
এঁরা	এঁ	(৪)
ট্যাক	অ্যা	(৫)
ট্যাঁক	অ্যাঁ	(৬)
বাধা	আ	(৭)
বাঁধা	আঁ	(৮)
গদ	অ	(৯)
গঁদ	অঁ	(১০)
ওরা	ও	(১১)
ওঁরা	ওঁ	(১২)

কুড়ি উ (১৩)

কুঁড়ি উঁ (১৪)

অর্থাৎ, স্বর স্বনিম - ৭টি

আনুনাসিক স্বরস্বনিম - ৭টি

টিপ্পনী

বাংলায় সুরাঘাত ও সুরতরঙ্গ (Pitch and Intonation in Bengali)

স্বরতন্ত্রীর (Vocal Cord) কম্পনের তীব্রতা বাড়িয়ে কোন ধ্বনি বা শব্দের উপরে জোর দিলে তাকে সুরাঘাত বা স্বরাঘাত (Pitch Accent) বলে।

যখন কোন শব্দের অন্তর্গত কোন বিশেষ ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছের উপর সুরাঘাত বা স্বরাঘাত দেওয়ার ফলে শব্দের অর্থ নিয়ন্ত্রিত হয় তখন তাকে শব্দ - সুরাঘাত বলে। সুরের বা স্বরাঘাতের হ্রাস বৃদ্ধির দ্বারা যখন সমগ্র বাক্যের অর্থ নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সেই সুরের ওঠা নামাকে সুরতরঙ্গ বা স্বরতরঙ্গ (Intonation) বলে।

বৈদিক ভাষায় এই স্বরঘাতের তিনটি শ্রেনী নির্নীত হয়েছিলো। যথা (ক) উদাও (খ) অনুদাও (গ) স্বরিত।

(ক) উদাও (High or Acute tone) : সুর যখন উঁচুতে ওঠে তখন হয় উদাও।

(খ) অনুদাও (Lowor Grave tone) : সুর নীচে নামলে হয় অনুদাও।

(গ) স্বরতি (Combined /Circumflex tone) : এই দুয়ের সমাহার ঘটলে হয় স্বরিত

স্বরের স্থান পরিবর্তনে শব্দের বা বাক্যের অর্থের পরিবর্তন হতো।

যেমন : রক্ষস = রাক্ষস (ক্লীব লিঙ্গ), কিন্তু

র্ক্ষস = পবিত্রতা (পুং)।

লিঙ্গ নির্নয়ের ক্ষেত্রে স্বরের উপযোগিতা ছিল -

যেমন : ব্রক্ষণ = প্রার্থনা, স্তব (ক্লীব),

টিপ্পনী

ব্রক্ষণ = প্রার্থনাকারী ; স্তোতা (পুং)

সমাস নির্নয়

রাজপুত্র = রাজা যার পুত্র (বহুব্রী) অর্থাৎরাজার বাবাকে বোঝাচ্ছে।

রার্জপুত্র = রাজার পুত্র (ষষ্ঠী তৎ) অর্থাৎ রাজার পুত্রকে বোঝাচ্ছে।

(১) সাধারন বিবৃতি মূলক বাক্য

এই ধরনের বাক্যেসুর উচ্চগ্রাম থেকে ক্রমশ নিম্নগ্রামে নামে।

যেমন - "আমি কোলকাতা যাব"

(২) প্রশ্নবোধক বাক্য

এই ধরনের বাক্যে সুর সাধারনত নিম্ন থেকে উর্ধ্বগামী হয়।

যেমন - সুমন কি বলে ?

(৩) সংশয় বা দ্বিধামুলক বাক্য

এই ধরনের সংশয় থাকার জন্য সুরতরঙ্গ ওঠানামা না করে সারা বাক্যে একই রকম থাকে।

যেমন - সুমন মিথ্যা কথা বলে।

(৪) নির্দেশমূলক বাক্য

আদেশ, নির্দেশ বা অনুরোধ বোঝালে বাক্যের সুরতরঙ্গ উচ্চ থেকে নিম্নগামী হয়।

যেমন, আপনারা এবার খেতে বসুন।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. স্বনিম বা মূলধ্বনি কাকে বলে উদাহরন সহ বুঝিয়ে দাও।

২. উপধ্বনিবা পূরক ধ্বনি বা সহধ্বনি বা বিস্বন কাকে বলে আলোচনা কর।

৩. স্বনিম হতে গেলে প্রয়োজনীয় শর্তগুলি কিকি উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

৪. ব্যঞ্জন স্বনিমের দৃষ্টান্ত দাও এবং তা কত রূপে হতে পারে আলোচনা কর।

৫. স্বরস্বনিম কত প্রকার উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

৬. আনুনাসিক স্বরধ্বনিমের দৃষ্টান্ত দাও।

৭. সুরাঘাত ও সুরতরঙ্গ বলতে কি বোঝ লেখ।

টিপ্পনী

ঋনস্বীকার

১. "সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা", ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপনি, কলকাতা - ৯

২. "ভাষা বিদ্যাপরিচয়" - শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, জয়দূর্গা লাইব্রেরী, কোলকাতা - ৯

টিপ্পনী

বাংলা স্বনিমের উচ্চারণ প্রক্রিয়া

টিপ্পনী

ভাষা বিশ্লেষণ করলে তার মূলে পাওয়া যায় কিছু বিচিত্র ধ্বনি। ভাষা বাক্য ভিত্তিক। স্পষ্ট উচ্চারিত অর্থযুক্ত ধ্বনি সমষ্টি তথা শব্দের সাহায্যে মানুষ যখন পরস্পরকেসঙ্গেভাব বিনিময় করে থাকে তখন তাকে 'ভাষা' বলে।

আমরা যখন কথা বলি, তখন ফুসফুস থেকে নিৎশ্বাসবায়ূ শ্বাসনালির ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় স্বরতন্ত্রীতে, মুখ ও নাসিকার কোন কোন অংশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যে বায়ু তরঙ্গের সৃষ্টি করে একে ধ্বনি তরঙ্গ বলে। এই ধ্বনি তরঙ্গ বায়ুতে প্রবাহিত হয়ে কখনো শ্রোতার কর্নমূলে পৌঁছয় এবং ক্রমশ তা স্নায়ু তন্ত্রীর মধ্য দিয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করে। এই তিনটি স্তরের মধ্য দিয়ে বক্তার বক্তব্য উচ্চারিত ধ্বনি রূপে ধ্বনিতরঙ্গ রূপে এবং শ্রুতি রূপে শ্রোতার কানে পৌঁছলে সেই শ্রবন প্রক্রিয়াকে উচ্চারণ মূলক ধ্বনি বিজ্ঞান (Articulatory Phonetics) বলে। ধ্বনিবিজ্ঞানে এই উচ্চারণ মূলক আলোচনা টুকু ভাষা বিজ্ঞান চর্চার আবিষ্কার রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে।এই উচ্চারণ প্রক্রিয়ার প্রধান অঙ্গ বাগযন্ত্র।

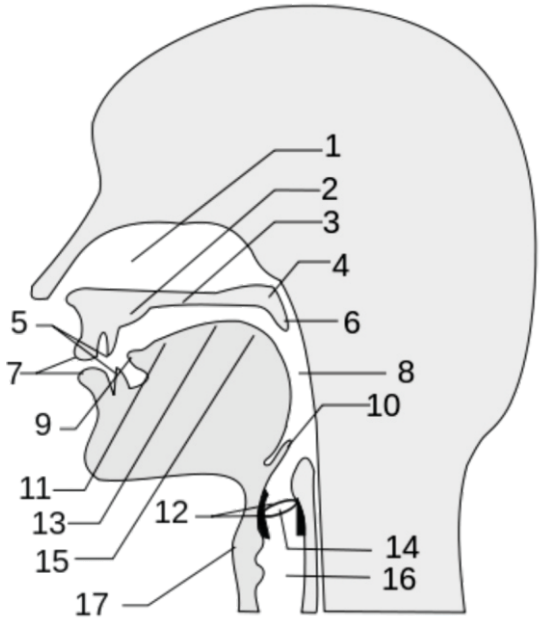

1. NC	2. TR
3. D	4. SP
5. TT	6. U
7. LL	8. Ph
9. A	10. WP
11.BL	12. VC
13. FT	14. G
15. BT	16. LARYNX
17. ADAM'S APPLE	

টিপ্পনী

বাগযন্ত্রের চিত্রেয় বিভিন্ন অংশের পরিচিতি

NC	= Nasal Cavity	= নাসিকা গহ্বর	
OC	= Oral Cavity	= মুখ গহ্বর	
LL	= Lips	= ওষ্ঠ ও অধর	
TT	= Teeth	= দন্ত	
TR	= Tceth-ridge = Alvcolae	= দন্তমুল	= মাড়ী
HP	= Hard Plate	= শক্ত তালু	= অগ্রতালু
D	= Dome	= মূর্ধা	= সর্বোচ্চ তালু
SP	= Soft Plate = Vclum	= নরম তালু	
U	= Uvula	= আলজিভ	= শুন্ডিকা
A	= Apex = Tip of the tongue	= জিহ্বাপ্রান্ত	= জিহ্বাশিখর
FT	= Front of the tongue	= জিহ্বার সম্মুখ ভাগ	
BT	= Back of the tongue	= জিহ্বার পশ্চাৎ ভাগ	
PH	= Pharynx	= কন্ঠনালী	= গলমুখ
WP	= Wind - pipe = Trachea	= শ্বাসনালী	
G	= Gullet = Oesophagus	= খাদ্যনালী	
E	= Epiglottis	= উপজিহ্বা	= অধিজিহ্বা
VC	= Vocal chords	= স্বরতন্ত্রী	= কন্ঠতন্ত্রী
Larynx		= স্বরযন্ত্র	= স্বরকক্ষ
Nostrill		= নাসারন্ধ্র	= নাসাপথ
Adamis apple		= আদমের আপেল	
Lungs		= ফুসফুস	

RT = Root of the Tongue = জিহ্বামূল

[সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলাভাষা ড. রামেশ্র শ, পৃ - ২১৪ - ২২৫]

ভাষা হচ্ছে মানুষের বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির সমষ্টি। আবার, দেহের যে সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা যন্ত্রের সাহায্যে আমরা কথাবলি তথা নানা প্রকারধ্বনি উচ্চারণ করে থাকি, তাকে বলা হয় বাগযন্ত্র (Vocal Organ)।

টিপ্পনী

মুখ, নাসিকা, কণ্ঠ জিহ্বা, ফুসফুস প্রভৃতি অঙ্গ-প্রতঙ্গের বিভিন্ন অংশের সাহায্যে ভাষায় ব্যবহৃত বা ব্যবহারযোগ্য ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয় বলে এগুলিকে একত্রে বাগযন্ত্র বলে।

আমাদের ফুসফুস থেকে একটি নলের সাহায্যে শ্বাস বায়ু মুখ-গহ্বর (Oral Cavity =OC) ও নাসিকা গহ্বরে (Nasal Cavity =NC) তে এসে পৌঁছায়। যার নীচের প্রান্ত ফুসফুসের সাথে যুক্ত এবং উপরের প্রান্ত মুখগহ্বর ও নাসিকার দিকে উন্মুক্ত আছে আছে। এই নলটিরমধ্য দিয়ে ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু যাতাযাত করে। এই নলটি হল শ্বাসনালী (Wind Pipe = WP)। এই শ্বাসনালীর সাথে সমান্তরালে আর একটি নালী গলা থেকে নেমে আছে; যার নীচের প্রান্ত পাকস্থলীর সাথে যুক্ত। এর উপরে অংশ মুখগহ্বর ও নাসিকা গহ্বরের দিকে খুলে আছে। যাকে খাদ্যনালী বলে। তবে খাদ্যনালী ধ্বনি সৃষ্টিতে কোন ভূমিকা গ্রহন করে না। শ্বাসনালীই ধ্বনি সৃষ্টিতে সহায়তা করে। শ্বাসনালীর উপরের অংশে গলগন্ডের কাছে এই উঁচু হয়ে থাকে। যাকে আদমের আপেল বলে। শ্বাসনালীর ঔ ফোলা অংশকে স্বরযন্ত্র বলেছেন। ফুসফুস থেকে শ্বাসবায়ু পথে ঔ ফোলা অংশে বাধা পায়। ঐখানে দুটি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বা জিভের মতো পাতলা দুটি নমনীয় পর্দা আছে। যাকে স্বরতন্ত্রী বলে। পর্দাদুটি গলার সামনের দিকে পরস্পরের সাথে যুক্ত এবং পেছনের দিকে খোলা থাকে। এই পর্দাদুটির মাঝখান দিয়ে শ্বাসবায়ু যাতাযাত করে। একে স্বরপথ বলে।

শ্বাসবায়ু যাতাযাতের সময় স্বরতন্ত্রী প্রধানত চার-রকম অবস্থানে থাকতে পারে।

(১) পূর্ণবিচ্ছেদের অবস্থান।

(২) পূর্নসংযোগের অবস্থান।

টিপ্পনী

(৩) প্রায় পূর্ন সংযোগের অবস্থান।

(৪) প্রায় পূর্ন বিচ্ছেদের অবস্থান।

স্বরতন্ত্রী দুটি যখন ১নং অবস্থানে থাকে। অর্থাৎ পরস্পর থেকে যখন সবচেয়ে বেশী দূরত্বে থাকে তখন শ্বাসবায়ু বিনাবাধায় যাতাযাত করে ফলে কম্পনজাত কোন সুরও সৃষ্টি হয় না। এই অবস্থায় যে ধ্বনি উচ্চারণ করি সে গুলিকে অঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় ধ্বনি (ক, খ, চ, ছ) এবং শ, স ইত্যাদি। আবার স্বরতন্ত্রী দুটি যখন ২নং অবস্থানে থাকে অর্থাৎ স্বরতন্ত্রী দুটি পূর্ন সংযোগের অবস্থান থাকে তখন ঐ পথ দিয়ে কোন শ্বাসবায়ু যাতাযাত করতেপারে না, ফলে কোন সুর বা ঘোষ ও শোনা যায় না। স্বরতন্তরী দুটি সম্পূর্ন যুক্ত করে হঠাৎ খুলেদিলে এক রকম ধ্বনি সৃষ্টি হয়, তাকে বুদ্ধ-স্বরপথ-ধ্বনি বলে। এটি আবার স্বরতন্ত্রীদুটিকে ৩নং অবস্থানে অর্থাৎ প্রায় পূর্ন সংযোগের অবস্থানে আনলে তার মধ্য দিয়ে শ্বাসবায়ু যাতাযাত করার সময় একটা কম্পন সৃষ্টি হয় ফলে একটি সুর শোনা যায়। এই সুরই হল নাদ বা ঘোষ। এই সময় যে তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্বনি (গ, ঘ, জ, ঝ) ইত্যাদি।

কিন্তু স্বরতন্ত্রী দুটিকে ৪নং অবস্থানে অর্থাৎ প্রায় পূর্ন বিচ্ছেদের অবস্থানে এনে ধ্বনি উচ্চারণ করি তখন শ্বাসবায়ু তাদের কাঁপায় না, তখন ঘোষ সৃষ্টি হয় না। এটি ঘোষ সৃষ্টির অবস্থান এবং চরম বিচ্ছেদের অবস্থানের মধ্যবর্তী অবস্থা। যখন আমরা ফিসফিস করে কথা বলি তখন স্বরতন্ত্রী দুটি এই অবস্থানে থাকে।

ফুসফুস থেকে শ্বাসনালীএবং পাকস্থলী থেকে খাদ্যনালী বেরিয়ে গলার মধ্য দিয়ে সমান্তরাল ভাবে এসে মুখ-গহ্বরেযুক্ত হয়েছে। ফলে সেখানে একটি নালী বা মোহনা সৃষ্টি হয়েছে। এই মোহনা বা মিলন স্থলকে উর্ধ্বকন্ঠ বা কন্ঠনালী বা গলমুখ বলে। এই গলমুখ বা কন্ঠনালী থেকে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে কন্ঠনালীয় ধ্বনি বলে। এই ধ্বনির ব্যবহার নেই।

স্বরযন্ত্রের পর বাগযন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল নাসিকা, মুখ, জিহ্বা ইত্যাদি। নাসিকা গহ্বর এবং মুখগহ্বর মিলিয়ে একটি দোতালা কক্ষ সৃষ্টি হয়েছে। শ্বাসবায়ু ফুসফুস থেকে শ্বাসনালী দিয়ে বের হওয়ার সময় যদি নাসিকা গহ্বরের দেয়ালে জোরে ঘর্ষিত হয় তাহলে একটি অনুরনন শোনা যায়। এই অনুরননের ফলে নাসিক্য ধ্বনি আনুনাসিক ধ্বনি শোনা যায়। যেমন ম,ন, ক্ষ, ন ইত্যাদি।

আমাদের দুটি ওষ্ঠের মধ্যে, উপরের টিকে ওষ্ঠ এবং নীচের দিকে অধর বলে। দুটি ওষ্ঠ মিলিত হয়ে ঔষ্ঠ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন - প, ফ, ব, ভ, ইত্যাদি।

আবার দাঁত থেকে জিহ্বার সাহায্যে দন্ত্য ধ্বনি উচ্চারিত হয়। যেমন - ত, থ, দ, ধ।

টিপ্পনী

দাঁতের পরে বাগযন্ত্রের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল মুখের ছাদ। এই মুখের ছাদকে চারভাগে ভাগ করা হয়। দাঁতের মাঢ়ী বা দন্তমূল(TR = Teeth-ridge); শক্ততালু বা অগ্রতালু(HP = Hard palate); নরমতালু বা পশ্চাৎতালু বা স্নিগ্ধ তালু (Soft Plate =Velum = SP); এবং আলজিভ বা শুন্ডিকা (Uvula = U)।

শক্ততালু থেকে জিভের সাহায্যে ট, ঠ, ড,ঢ ধ্বনি উচ্চারিত হয়। এদের মূর্ধা ধ্বনি বলা হয়। এবং অগ্র তালু থেকে তালব্য ধ্বনি যথা চ, ছ, জ, ঝ প্রভৃতি উচ্চারিত হয়। পশ্চাৎ তালু থেকে জিভের সাহায্যে উচ্চারিত হয় - ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি ধ্বনি। এদের কন্ঠ্য ধ্বনি বলা হয়।

ভাষার ধ্বনি সৃষ্টিতে জিহ্বার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন। জিহ্বার পিছনের অংশ কন্ঠনালীর কাছে গলার সাথে যক্ত। বিভিন্ন শ্রেনীর ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের এক এক অংশ দাঁত, মুখের ছাদ প্রভৃতি স্থান স্পর্শ করে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি সৃষ্টি। ভাষা বিজ্ঞানীরা জিহ্বাকে তিনটি অংশে ভাগ করেছেন - (১) জিহ্বাফলক (BL = Blade) (২) সম্মুখজিহ্বা (FT = Front of the tongue) (৩) পশ্চাৎ জিহ্বা (BT = Back of the tongue)। ভাষার ধ্বনি উচ্চারণ ও ধ্বনি বৈচিত্র সৃষ্টিতে জিহ্বায় ভূমিকাই মুখ্য।

ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি গুলিকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে - (ক) স্বরধ্বনি (২) ব্যাঞ্জনধ্বনি।

উচ্চারণ প্রকৃতি ও উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী ব্যাঞ্জন ধ্বনির শ্রেনীবিভাগ

মুখবিবরের মধ্য দিয়ে শ্বাস বায়ু প্রবাহিত হওয়ার সময় যখন কোন স্থানে সেটি বাধা প্রাপ্ত হয় তখন যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেই ধ্বনি গুলিকে ব্যাঞ্জন ধ্বনি বলে।

স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু বাধা প্রাপ্ত হয় না। কিছু ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণ কালে বাধা প্রাপ্ত হয়।

টিপ্পনী

ব্যাঞ্জনধ্বনি গুলিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করার সময় ভাষা তাত্ত্বিকেরা দুটি প্রধান জিনিস লক্ষ্য করেছেন - (ক) ব্যাঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ স্থান অর্থাৎ নিশ্বাস বায়ু কোথায় বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। (খ) ব্যাঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের প্রকৃতিকে অর্থাৎ নিশ্বাস বায়ু কিভাবে বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে।

চিত্রের সাহায্যে ব্যাঞ্জনধ্বনি গুলিকে বিভিন্ন ভাগে এভাবে বিভক্ত করা যেতে পারে। এখানে ধ্বনিগুলির উচ্চারণের সাথে ধ্বনিগুলির পাশে আন্তর্জাতিক বর্নমালার চিহ্ন দিয়ে দেওয়া হল // চিহ্নের মধ্যে। [পরের পৃষ্ঠায় চিত্র দেওয়া হল]

উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী ব্যাঞ্জনধ্বনি গুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যেতে পারে -

ওষ্ঠ্যধ্বনি

ব্যঞ্জনধ্বনি গুলি উচ্চারণের সমনয় শ্বাসবায়ু যদি নিম্নের অধর ও ওপরের ওষ্ঠ্য দ্বারা বাধাপ্রাপ্তহয় তখন যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেগুলিকে বোষ্ঠ্য ধ্বনি বলে। যেমন - প, ফ, ব, ভ, ম, ও /p/ph/b/bh/m/o/ ইত্যাদি

দন্ত্যধ্বনি

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের অগ্রভাগ দাঁত স্পর্শ করলে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেগুলিকে দন্ত্যধ্বনি বলে। যেমন - ত, থ, দ, ধ, ন, /t/th/d/dh/n ইত্যাদি।

দন্ত্যমূলীয় ধবনি

জিভের অগ্রভাগ যদি উপরের দাঁতের পিছনে দন্ত্যমূল স্পর্শ করে, তখন যে ধবনি উচ্চারিত হয় তা দন্তমূলীয় ধ্বনি বলে। যেমন - র, ল, /r/l/ ইত্যাদি।

তালব্যধ্বনি

জিভের অগ্রভাগ যখন মুখের ছাদের সামনের দিকে তালুস্পর্শ করে তখন যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সে গুলিকে তাল্য ধ্বনি বলে। যেমন - চ, ছ, জ, ঝ, শ, /c/ch/j/jh/s/ ইত্যাদি।

উচ্চারনের স্থান	ওষ্ঠ্য		দন্ত্য		দন্তমূলীয়		মূর্ধন্য		তালব্য		কণ্ঠ্য		কণ্ঠমূলীয়	
উচ্চারনের প্রকৃতি	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ
স্পর্শ অল্পপ্রাণ	প্ / p /	ব্ / b /	ত্ / t /	দ্ / d /			ট্ / t /	ড / d /			ক্ / k /	গ / g /		
মহাপ্রাণ	ফ্ / p^h /	ভ্ / b^h /	থ্ / t^h /	থ্ / t^h /			ঠ / t^h /	ঢ / d^h /			খ্ / k^h /	ঘ / g^h /		
ঘৃষ্ট অল্পপ্রাণ									চ / c /	জ / j /				
মহাপ্রাণ									ছ / c^h /	ঝ / j^h /				
উষ্ম			প্ / p /						শ / ʃ /					হ / h /
নাসিক্য		ম্ / m /		ন্ / n /							ঙ / n /			
কম্পিত							র্ / r /							
তাড়িত অল্পপ্রাণ									ড় / ɽ /					
মহাপ্রাণ									ঢ় / $ɽ^h$ /					
পার্শ্বিক						ল / l /								
অধস্বর		ও / o /							এ / e /					

টিপ্পনী

মূর্ধন্যধ্বনি

জিভের অগ্রভাগ যদি মুখগহ্বরের ভিতরে পিছনের দিকে মুর্ধণ্য স্পর্শ করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করে সে গুলিকে মুর্ধণ্য ধ্বনি বলে। যেমন - ট,. ঠ, ড, ঢ, ড়, ঢ়, /t/th/d/dh/y/y/ ইত্যাদি।

কণ্ঠ্যধ্বনি

কণ্ঠ থেকে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে কণ্ঠ্যধ্বনি বলে। যেমন - ক,খ,গ,ঘ,ঙ, /k/kh/g/gh/n/ ইত্যাদি।

কণ্ঠনালীয় ধ্বনি

উচ্চারণের সময় কণ্ঠ্যনালির পেশীতে আকুঞ্চনের ফলে যে ধ্বনি সৃষ্টি হয় তা কণ্ঠনালীয় ধ্বনি। যেমন - হ, /h/।

উচ্চারণ প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেনি বিভাগ

স্পর্শধ্বনি

শ্বাসবায়ু যখন সম্পূর্ন রূপে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হঠাৎ বাধামুক্ত হয় তখন যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সে গুলিকে স্পর্শধ্বনি বলে। যেমন - প, ফ, ব, ভ, ত, থ, দ, ধ, ট, ঠ, ড, ঢ, /p/p^h/b/b^h/t/t^h/d/d^h/t/t^h/d/d^h/ ইত্যাদি

ঘৃষ্টধ্বনি

শ্বাসবায়ূ আংশিক বাধা প্রাপ্ত হয়ে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, সেুগুলিকে ঘৃষ্ট ধ্বনি বলে। যেমন - চ,দ,জ,ঝ, /c/c^h/j/j^h/ ইত্যাদি

উষ্মধ্বনি

উর্ধ্বস্থ ও নিম্নস্থ উচ্চাবক বা স্বরতন্ত্রী দুটি পরস্পরের খুব কাছাকাছি আসার ফলে যদি শ্বাসবায়ু যাতাযাতে আংশিক বাধার সৃষ্টি হয় এবং সেই বাধা ঠেলে যাতাযাত করা ফলে যদি একটি ঘর্ষন সৃষ্টি হয় তখন যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সে গুলিকে উষ্মাধ্বনি বলে। যেমন - শ, ষ, স, /s/ ইত্যাদি।

নাসিক্যধ্বনি

শ্বাসবায়ু নাসাপথে নির্গত হওয়ার সময় যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, সে গুলিকে নাসিক্য ধ্বনি বলে। যেমন - ম, ন, ঙ /m/n/n ইত্যাদি।

কম্পিত ধ্বনি

এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বার অগ্রভাগ আংশিক কম্পিত হয়। যেমন - র/r/ ইতাদি।

তাড়িত ধ্বনি

জিহ্বার তলদেশ দিয়ে দন্তমূলে বার বার আঘাত করে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে তাড়িত ধ্বনি বলে। যেমন - ড়,ঢ়, /y/y^h/ ইত্যাদি।

পার্শ্বিক ধ্বনি

জিভের একপাশ ঘেঁসে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তাকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। যেমন বালায় ল/l/ ধ্বনি পার্শ্বিক ধ্বনি।

অর্ধস্বর

ও, এ ধ্বনিগুলিকে ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যে আলোচনা করা সঙ্গত, কারন এই ধ্বনিগুলি স্বরধ্বনি নয়। আবার স্বরধ্বনির মতো অক্ষর সৃষ্টি করার ক্ষমতা এদের নেই। আবার এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু অবাধে নির্গত হয় না। অপরদিকে এই অর্ধস্বর উচ্চারণ কাল ব্যঞ্জনধ্বনির মতো শ্বাসবায়ু সম্পূর্ন বাধাগ্রস্ত হয় না । বাংলায় - ও (অন্তঃস্থব) এবং এ(য়) এই দুটি অর্ধস্বর।

এই দুটি ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা মুখবিবরের মধ্যে এমন ভাবে অবস্থান করে যে স্বরধ্বনি 'ই' এবং 'উ' উচ্চারণ কালে জিহ্বা যতটা উপরে ওঠে তার থেকে ও উপরে ওঠে শ্বাসবায়ুকে বাধা দেওয়ায় চেষ্টা করে। ঠোটের অবস্থানও কুঞ্চিত হয় ফলে বায়ু পথ আংশিক রুদ্ধহয়। এই সময় - 'য়' ধ্বনি (যায়, খায়, হয় ইত্যাদি) এবং অন্তঃস্থয় ধ্বনি (ওয়)। যেমন (হাওয়া, খাওয়া, বওয়া ইত্যাদি) উচ্চারিত হয়।

এখানে- ও (=ওয়) ওষ্ঠ্যধ্বনি।

এ (=য়) তালব্য ধ্বনি

টিপ্পনী

টিপ্পনী

সঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি

অঘোষ

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালীর মধ্যদিয়ে শ্বাসবায়ু অবাধে বেরিয়ে আসে, সেগুলিকে অঘেষ ধ্বনি বলে। যেমন - বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ যথা - ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ, শ ইত্যাদি।

সঘোষ

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় কণ্ঠতন্ত্রী দুটি প্রসারিত হয়ে কণ্ঠনালীর মধ্য দিয়ে নির্গত শ্বাসবায়ুকে বাধাদেয় সেই ধ্বনি গুলিকে ঘোষ বা সঘোষ ধ্বনি বলে। যেমন - বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ। যথা - গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ ইত্যাদি।

অল্পপ্রাণ

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু যাত্রাপথে আংশিক বাধা পায় তাকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন - বর্গের প্রথম, তৃতীয় ধ্বনি। যথা - ক, গ, চ, জ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ

যে ধ্বনি উচ্চারণেরসময় শ্বাসবায়ু যাত্রাপথে বাধা পায় অর্থাৎ শ্বাসবায়ু জোরে নির্গত হয়। যেমন - বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ। যথা খ, ঘ, ছ, ঝ ইত্যাদি।

স্বরধ্বনি গুলির শ্রেনিবিভাগ

যে ধ্বনি উচ্চারণে নিশ্বাস বায়ু মূল বিষয়ের কোথাও কোন রকম বাধা পায়না তাকে স্বরধ্বনি বলে।

মৌলিক স্বরধ্বনি গুনগত শ্রেনি বিভাগের মানদন্ড হল তনটি - (১) জিহ্বার অবস্থান (২) মূল বিষয়ের শূন্যতার পরিমাপ (৩) ওষ্ঠের প্রাকৃতি

এই আটটি স্বরধ্বনিকে প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি বলে।

জিহ্বার অবস্থান

যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা সামনের দিকে(অর্থাৎ ওষ্ঠের দিকে) এগিয়ে আসে সেই স্বরধ্বনিকে সম্মুখ স্বরধ্বনি বলে।

যেমন- প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি [i,e ,ɛ,]

বাংলা স্বরধ্বনি - উ, ও, অ্যা

আবার যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ পিছন দিকে (অর্থাৎ গলার দিকে) গুটিয়ে যায় তাকে পশ্চাৎ স্বরধ্বনি বলে।

যেমন- প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি u, o,ɔ, a

বাংলা স্বরধ্বনি উ, ও, অ

সম্মূল্য স্বর ও পশ্চাৎ স্বরের মাঝামাঝি অবস্থানে জিভকে রেখে যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকে কেন্দ্রিয় স্বরধ্বনি বলে।

যেমন - বাংলা - আ/ a

গৌন মৌলিক স্বরধ্বনি - ɔ

যে স্বরধ্বনি উচ্চারণের সময় জিহ্বা স্বরধ্বনি এলাকার মধ্যেই সর্বোচ্চ অবস্থানের বা তার কাছাকাছি অবস্থানে থাকে তাকে উচ্চ স্বরধ্বনি বলে।

যেমন - উচ্চ স্বরধ্বনি হলো প্রাধমিক মৌলিক স্বরধ্বনি - i, iu বাংলা ইউ /iu/

আবার জিভকে যদি একদম নিচে নামিয়ে যেমন স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তবে সেটা হবে নিম্ন স্বরধ্বনি।

যেমন - প্রাথমিক মৌলিক স্বরধ্বনি বাংলা - আ /a/

উচ্চস্বর স্বরধ্বনির উচ্চারণ স্থান থেকে নিচে মুখের ভিতরে যে শূন্য স্থান থাকে তার সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে তার প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে জিভকে নামিয়ে এবং যদি আমরা কোন স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তবে সেটাই হবে উচ্চ-মধ্য স্বরধ্বনি।

উচ্চস্বর ধ্বনির উচ্চারণ স্থান থেকে নিচে মুখের ভিতরে যে শূনস্থান থাকে তার মধ্যে নিচে থেকে প্রায় এক তৃতীয়াংশ ছেড়ে আমরা জিভকে যদি উপরে তুলে ধরে কোনো স্বরধ্বনি উচ্চারণ কি তবে সেটাই হবে নিম্ন মধ্য স্বর ধ্বনি।

মুখবিবরের শূন্যতার পরিমাপ

মুখবিবরের ভিতরের শূন্যস্থানের পরিমাপ অনুসারে স্বরধ্বনিকে ৪টি শ্রেনিতে

টিপ্পনী

টিপ্পনী

ভাগ করা যায় - সংবৃত, বিবৃত, অর্ধ-সংবৃত, অর্ধবিবৃত।

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভ স্বরধ্বনির এলাকার মধ্যে সর্বোচ্চ স্থানে থাকে এবং জিভ ও নিচের চোয়াল যতদূর সম্ভব মুলের ছাদের দিকে এগিয়ে থাকায় মুখের ভিতরের শূন্যস্থান প্রায় ভরে থাকে তাকে সংবৃত স্বরধ্বনি বলে।

জিভকে একদম নিচে নামিয়ে স্বাভাবিকতা বজায় রেখে নিচের চোয়ালকে মুখের ছাদ থেকে যতদূর সম্ভব দূরে সরিয়ে আনলে মূলের ভিতরের শূন্যস্থান একদম ফাঁকা থাকে এই অবস্থায় যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করা হয় তাকেই বিবৃত স্বরধ্বনি বলা হয়।

সংবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান থেকে বিবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান পর্যন্ত যে শূন্যস্থান জিভ ও নিচের চোয়ালের দ্বারা যদি তার দুই তৃতীয়াংশ ভরে থাকে তবে সেই অবস্থায় উচ্চারিত স্বরধ্বনিকে অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি বলে।

সংবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান থেকে বিবৃত স্বরধ্বনির অবস্থান পর্যন্ত যে শূন্যস্থান নিচে থাকে তার মাত্র এক তৃতীয়াংশ যদি জিভ ও নিচের চোয়ালের দ্বারা ভরে সেই অবস্থা থেকে উচ্চারিত স্বরধ্বনিকে অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি বলে।

ওষ্ঠের আকৃতি

ওষ্ঠের আকৃতি অনুসারে স্বরধ্বনির দুটি শ্রেনি নির্নয় করা হয় প্রসারিত এবং কুঞ্চিত ওষ্ঠকে দুদিকে (অর্থাৎ দুই কানের দিকে) প্রসারিত করে আমরা যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তাকে প্রসারিত স্বরধ্বনি বলে।

যেমন - প্রাথমিক স্বরধ্বনি - i e, বাংলা ই, এ।

কিন্তু ওষ্ঠ যদি দুইদিকে প্রসারিত না হয়ে ফুঁ দেওয়ার মতো গোল হয়ে কুঞ্চিত আকার ধারন করে তবে সেই অবস্থায় আমরা যে স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি তাকে কুঞ্চিত স্বরধ্বনি বলে।

যেমন - প্রাধমিক মৌলিক স্বরধ্বনি u o ɔ, বাংলায় উ ও অ

a পশ্চাৎস্বর হওয়া স্বত্বেও এটি উচ্চারণের সময় ওষ্ঠ কুঞ্চিত হয়না এই জন্য একে অকুঞ্চিত স্বর বলে।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. চিত্রসহ বাগযন্ত্রের বিভিন্ন অংশের পরিচয় দাও।

২. উচ্চারণের প্রকৃতি ও অবস্থান অনুযাবী ব্যঞ্জনধ্বনি গুলির শ্রেনীবিভাগ কর।

৩. অর্ধস্বর কাকে বলে উদাহরন সহ আলোচনা কর।

৪. উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী স্বরধ্বনি গুলির শ্রেনীবিভাগ কর।

৫. অঘেষ ও অঘোষ ধ্বনি কাকে বলে।

৬. অল্পপ্রান ও মহাপ্রান ধ্বনি কাকে বলে।

টিপ্পনী

ঋনস্বীকার

১. "সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা" ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপনী, কোলকাতা-৯

২. "ভষা বিদ্যা পরিচয়" শ্রী পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য জয়দূর্গা লাইব্রেরী, কোলকাতা - ৯

টিপ্পনী

বাংলাভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের সূত্র

টিপ্পনী

ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাল পরম্পরায় ভাষার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এই পরিবর্তনে মোটামুটি দুটি দিক। একটি তার উচ্চারন গত দিক, অপরটি তার অর্থগত দিক। উচ্চারনগত দিকটি ভাষার বহিরঙ্গ গত দিক। এই বহিরঙ্গ গঠনের মূল উপাদান ভাষার ধ্বনি অবশ্যই তা উচ্চারন ধ্বনি। অপরদিকে ভাষার অর্থগত দিক হল অন্তরঙ্গ গত দিক। এই অন্তরঙ্গ দিকটি অবশ্যই ভাষায় অর্থকেই সূচিত করে। অতএব ভাষা পরিবর্তনের দুটি পরধান দিক হল - (১) ধ্বনিপরিবর্তন (Sound Change) (২) অর্থপরিবর্তন (Scmantic Change)।

ধ্বনিপরিবর্তনের কারণগুলি হল

(ক) ভৌগলিক পরিবেশ ও জলবায়ু

(খ) অন্যজাতির ভাষার প্রভাব

(গ) উচ্চারনের ত্রুটি আরামপ্রিয়তা ও অনবধানতা

(ঘ) শ্রবনের ও বোধের ত্রুটি

(ঙ) সন্নিহিত ধ্বনির প্রভাব; ধ্বনিসৃষ্টি ও ধ্বনিলোপ

ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা ও সূত্র

আগেই বলেছি ভাষার বহিরঙ্গগত কারনে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন ভাষা বিজ্ঞানীরা ভাষার বহিরঙ্গগত ধ্বনি পরিবর্তনের কয়েকটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন। যেই সূত্রগুলিকে মোটামুটি চারটি ধারায় বিভক্ত করা যায়। যেমন -

(ক) ধ্বনির আগম

(খ) ধ্বনির লোপ

(গ) ধ্বনির রূপান্তর

(ঘ) ধ্বনির স্থানান্তর বা বিপর্যাস।

টিপ্পনী

(ক) ধ্বনির আগম

ধ্বনির আগম দু-রকমের হতে পারে। যথা স্বরধ্বনির আগম ও ব্যঞ্জনধ্বনির আগম।

আবার শব্দের ধ্বনির স্থান তিন রকম - আদিধ্বনি (Initial), মধ্য ধ্বনি (Medial) ও অন্তধ্বনি (Final)।

শব্দেরমধ্যে যে স্থানে ধ্বনি এসে যুক্ত হয়, সেই স্থান ভেদ অনুসারে ধ্বনির আগমকে আদি, মধ্য, ও অন্ত্য এই তিন ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে।

শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি এসে যে স্থানে যুক্ত হয় সেই স্থান ভেদ অনুসারে স্বরধ্বনির আগমকে তিন ভাগে ভাগ করাযায়-

যেমন - আদি স্বরাগম, মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি ও অন্ত্যস্বরাগম। একই ভাবে আদি ব্যঞ্জনাগম, মধ্যব্যঞ্জনাগম বা শ্রুতিধ্বনি ও অন্ত্যব্যঞ্জনাগম।

আদিস্বরাগম

সাধারনত শব্দের আদিতে সংযুক্ত ব্যঞ্জন থাকলে সেই সংযুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারন প্রক্রিয়াকে সহজতর বা উচ্চারন সৌকর্যের তার আগে একটি স্বরধ্বনি এনে উচ্চারন করা হয়। শব্দের আদিতে স্বরধ্বনির এই আবির্ভাবকে আদিস্বরাগম বলে।

যেমন: স্পৃহা > আস্পৃহা

স্কুল > ইস্কুল

স্টেবল > আস্তাবল

স্ত্রী > পালি ইস্ত্রি

মধ্যাস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি

সাধারণত যুক্ত ব্যঞ্জন উচ্চারন করা কষ্টকর, যুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারনের কষ্ট লাঘব করার জন্য যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি যোগ করে তা উচ্চারন করা হয়। যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে এইভাবে স্বরধ্বনির আবির্ভাবকে বলা হয় মধ্যাস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।

বিপ্রকর্ষ

প্রকর্ষমানে প্রকৃষ্ট রূপে আকর্ষন। বিপ্রকর্ষ মানে সেই আকর্ষন যে প্রক্রিয়ায় বিগত হয়েছে বা শিথিলহয়েছে। যুক্ত ব্যঞ্জনের ধ্বনিগুলির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসার ফলে ব্যঞ্জনধ্বনি গুলির মধ্যে পারস্পারিক আকর্ষন কমে যায় অর্থাৎ ব্যঞ্জনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই জন্য এই প্রক্রিয়াকে বিপ্রকর্ষ বলে।

আবার এই প্রক্রিয়ায় স্বরধ্বনি গুলির প্রতি অধিক ভক্তি বা অনুরাগ দেখানো হয়, সেই কারনে একে স্বরভক্তি বলে।

যেমন- ভক্তি > ভকতি

ভ্+অ+ক্+ত্+ই > ভ্+অ+ক্+অ+ত্+ই।

অর্থাৎ ভক্তিশব্দে ক্ ও ত্ ধ্বনির মাঝে কোন স্বরধ্বনি ছিল না। কিন্তু 'ভকতি' শব্দে 'ক' ও 'ত' ধ্বনির মাঝে 'অ' স্বরধ্বনিটি যুক্ত হয়েছে।

তেমনি - মনোহর্থ > মনোরথ

গ্লাশ > গেলাশ

গার্দ > গারদ ইত্যাদি

অন্ত্যস্বরাগম

সাধারনত শব্দের শেষে স্বরধ্বনির আগমকে অন্ত্যস্বরাগম বলে। তবে বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে শব্দের শেষে কোন ব্যঞ্জন স্বরধ্বনি ছাড়া থাকতে পারে না।

যেমন- বেন্চ > বেন্চি

(ব্+এ+ন্+চ্ > ব্+এ+ন্+চ্+ই)

একইভাবে- গিল্ট > গিল্টি

দিশ > দিশা

এছাড়া অপিনিহিতি কে ও স্বরাগমের মধ্যে ধরা হয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

অপিনিহিতি

শব্দ মধ্যস্থ ব্যঞ্জনের পরে 'ই' বা' উ' থাকলে উচ্চারন কালে সেই 'ই' বা 'উ' সেই ব্যঞ্জনের আগে সরে উচ্চারিত হয়। এছাড়া শব্দে য -কলা -যুক্ত ব্যঞ্জন বা 'ক্ষ' বা 'জ্ঞ' থাকলে ও তার আগে একটা অতিরিক্ত 'ই' বা 'উ' উচ্চারিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে অপিনিহিতি বলে।

যেমন- করিয়া > কইর্‌্যা

(ক্+অ+র্+ই+য়+আ > ক্+অ+ই+র্+য্+আ)

এখানে করিয়া শব্দে 'ই' ধ্বনিটি 'র' এর পরে ছিল কিন্তু 'কইর্‌্যা' শব্দে 'ই' 'র' এর আগে সরে এসেছে।

একইভাবে- বাক্য > বাইক্ক

যজ্ঞ > যইজ্জ ইত্যাদি।

আদি ব্যঞ্জনাগম

শব্দের আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনি যোগ হলে তাকে আদি ব্যঞ্জনাগম বলে।

বাংলা ভাষা শুধুমাত্র শব্দের আদিতে 'র' ধ্বনির আগম ঘটে। তবে যে সব শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি থাকে কেবলমাত্র সেই শব্দের আগে 'র' এর আগম ঘটে।

যেমন- ঋজু > উজু>রুজু ['উ' এ আগে 'র' এর আগম]

উপাধ্যায় > প্রকৃত উবজাঝাঅ > বাংলা ওঝ>রোজা। 'ও' এর আগে 'র' এর আগম।

অন্ত্যব্যঞ্জনাগম

শব্দের ব্যঞ্জনধ্বনির আগমকে অন্ত্যব্যঞ্জনাগম বলে।

যেমন- বাবু > বাবুন

খোকা > খোকন

মধ্যাব্যঞ্জনাগম/শ্রুতিধ্বনি

শব্দের ধ্বনিগুলি উচ্চারন করার সময় অসাবধানতা বশত আমরা দুটি ধ্বনির মাঝে কোন অতিরিক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারন করে ফেলি। সেই প্রক্রিয়াকে মধ্যব্যঞ্জনাগম বলে।

টিপ্পনী

যে অতিরিক্ত ধ্বনিটি উচ্চারিত হয় তাকে শ্রুতিধ্বনি বলে।

যেমন - চা + এর (ষষ্ঠী ইভক্তি) > চায়ের ('য়' এর আগমন হয়েছে)

এভাবে শব্দের মধ্যে যে ব্যঞ্জনধ্বনির আগম ঘটে সেই ব্যঞ্জনের নাম অনুসারে শ্রুতি ধ্বনিটিরনামকরন করা হয়ে থাকে।

'য়' - শ্রুতি

মোদক > মোঅঅ (দও ক এর লোপ) > মোয়া (য় এর আগম)

ওয়- শ্রুতি

যা (= to go ধাহ) + আ (প্রত্যয়) > যাওয়া (ওয় এর আগম)

হ-শ্রুতি

সংকৃত বিপুলা > প্রাকৃত বিউলা (পএর লোপ) > বিহুলা (হ এর আগম) > বেহুলা।

দ-শ্রুতি

বানর > বান্দর (দ এর আগম) > বাঁদর

জেনারেল > জান্দরেল (দ এর আগম) > জাঁদরেল

ব-শ্রুতি

সংস্কৃত তাম্র > তমবর (ব এর আগম) প্রাকৃত তম্ব > বাংলা তাঁবা ইত্যাদি

(খ) ধ্বনির লোপ

ধ্বনির এই আগমের মতো স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির লোপ ঘটে।

টিপ্পনী

আদিস্বরলোপ

শব্দের মধ্যবর্তী কোন অক্ষরে শ্বাসঘাতের ফলে যদি শব্দের আদি স্বরধ্বনিটি ক্ষীন হতে হতে ক্রমশ লোপ পায় তবে তাকে আদি স্বরলোপ বলে।

যেমন- উদ্ধার > উধার > ধার (উ লোপ)

অলাবু > লাউ (অ লোপ)

মধ্যস্বর লোপ

সাধারণতৎ শব্দের আদি অক্ষরে শ্বাসঘাতের ফলে যদি মধ্যবর্তী কোন স্বরধ্বনি ক্ষীন হয়ে ক্রমশ লোপ পায় তবে তাকে মধ্যস্বরলোপ বলে।

যেমন- গামোছা > গামছা (ও লোপ)

(গ্+আ ম্+ও+ছ্+আ > গ+আ+ম+ছ+আ) (ও লোপ)

অন্ত্যস্বর লোপ

সাধারনত উচ্চারনের সময় শব্দের শেষের দিকে শ্বাসের জোর কমে আসে ফলে শেদর শেষে অবস্থিত স্বরধ্বনিটি ক্ষীন উচ্চারন হতে হতে শেষে লোপ পায় এই প্রক্রিয়াকে অন্তস্বর লোপ বলে।

যেমন- রাশি > রাশ (ই লোপ)

সন্ধ্যা > সাঁঝ

ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ

ব্যঞ্জনধ্বনির ক্ষেত্রে আদি ও অন্ত্যস্থান থেকে লোপের নিদর্শন নেই বললেই চলে। শুধু মাত্র যে সমস্ত শব্দের আদিতে 'র' ধ্বনি থাকে সেই 'র' এর লোপ লক্ষ্য করা যায়।

যেমন- আমের রস > রামের অস

ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পায় সাধারনত দুটি স্বরধ্বনির মাঝখান থেকে।

যেমন- সখী > সাই > সই

স্+অ+খ্+ই > শ্+অ+হ+ই > স্+অ+ই (হ লোপ)

স্বরমধ্যবর্তী একক ব্যঞ্জনছাড়া, যুগ্ম ব্যঞ্জনের একটি অবশ্য লোপ পায়।

যেমন - ভক্ত > ভত্ত > ভাত (দুটি 'ত' থেকে একটি 'ত' লোপ)

খড়দহ > খড়দা, ফলাআর > ফলার।

টিপ্পনী

সমাক্ষর লোপ

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমধ্বনির বা সমধ্বনিযুক্ত অক্ষরের মধ্যে একটি লোপ পায় তখন তাকে সমাক্ষর লোপ বলেল

যেমন - বড়দাদ > বড়দা (একটি অক্ষর 'দা' লোপ)

পাদোদক > পাদোক (একটি ধ্বনি 'দ' লোপ)

সমবর্ণ লোপ

শব্দের মধ্যে পাশাপশি অবস্থিত দুটি সমবর্ণ বা সমাক্ষরের মধ্যে থেকে একটি লেখায় বানানে লোপ পায় কিন্তু লোকের মুখে উচ্চারনে ঠিকই থাকে তাকে সমবর্ণ লোপ বলে।

যেমন - কৃষ্ণনগর (Krishnanagar) লেখা হত Krishnagar একটি 'na' বাদ দিয়ে লেখা হত। কিন্তু লোকের মুখে দুটি 'ন' ঠিকই থাকতো - ক্রিশ্নোনগোর (Krishonasagor)

(গ) ধ্বনির রূপান্তর

যখন একটি ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে অন্য একটি ধ্বনির রূপ লাভ করে তখন তাকে ধ্বনির রূপান্তর বলে।

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি উভয়েরই রূপান্তর হয়ে থাকে।

স্বরধ্বনি রূপান্তরের প্রধান প্রক্রিয়া হল অভিশ্রুতি ও স্বরসঙ্গতি। স্বরধ্বনি রূপান্তরের প্রধান প্রক্রিয়া হল সমীভবন, বিষমীভবন ইত্যাদি।

অভিশ্রুতি

অপিনিহিতির প্রক্রিয়া শব্দের মধ্যে যে 'ই' বা 'উ' তার পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের আগে

টিপ্পনী

সরে আসে সেই 'ই' বা 'উ' যখন পাশাপাশি স্বরধ্বনিকে প্রভাবিত করে এবং নিজে তার সঙ্গে মিশে পরিবর্তিত হয়ে যায় তখন তাকে অভিশ্রুতি বলে।

যেমন- করিয়া > কইরা > করে

করিয়া > অপিনিইতি কইর্য্যা > অভিশ্রুতি করে

স্বরসঙ্গতি

পাশাপাশি অবস্থিত দুটি ভিন্ন স্বরধ্বনি যদি একে অপরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যদি একই রকম স্বরধ্বনিতে পরিনত তবে সেই প্রক্রিয়াকে স্বরসংগতি বলে।

যেমন - সুপারি > সুপুরি

এখানে 'সুপারি' শব্দে 'উ' এর প্রভাব ও 'আ' স্বরধ্বনির পরিবর্তিত হয়ে একই ধ্বনি 'উ' তে রূপান্তরিত হয়েছে ল

স্বরসঙ্গতি তিন প্রকার - (১) প্রগত স্বরসঙ্গতি (২) পরাগত স্বরসঙ্গতি (৩) পারস্পরিক বা অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি।

(১) প্রগত স্বরসঙ্গতি

পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে যদি পরবর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত য়ে যায় তবে তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন - পূজা > পূজো

দিশাহারা > দিশেহারা

(২) পরাগত স্বরসংগতি

পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে যদি পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে যায় তবে তাকে পরাগত স্বরসংগতি বলে।

যেমন - দেশী > দিশী

(৩) পারস্পারিক বা অন্যোন্য

যদি পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনিই পরস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে

একই রকম বা কাছাকাছি স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে তাকে পারস্পরিক বা অন্যোন্য স্বরসঙ্গতি বলে।

যেমন - যদু > যোদো ইত্যাদি

সমীভবন

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বিষম ব্যঞ্জনধ্বনি পস্পরের প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে একই রকম ধ্বনিতে বা প্রায় অনুরূপ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন সেই পরক্রিয়াকে সমীভবন বলে।

যেমন - উৎ + লাস > উল্লাস ('ল' এর প্রভানবে 'ৎ' পরিবর্তিত হয়ে 'ল' হয়ে গেছে)

সমীভবন তিনপ্রকার -

(১) প্রগত সমীভবন (২) পরাগত সমীভবন এবং (৩) পারস্পরিক বা অন্যোন্য সমীভবন।

(১) প্রগত সমীভবন

পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে যদি পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে একই রকম বা কাছাকাছি ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে প্রগত সমীভবন বলে।

যেমন - পদ্ম > পদ্দ

(২) পরাগত সমীভবন

পরবর্তী ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাবে যদি পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে কাছাকাছি বা একই ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে পরাগত সমীভবন বলে।

যেমন - ধর্ম > ধম্ম

ভক্ত > ভত্ত

(৩) পারস্পারিক বা অন্যোন্য সমীভবন

পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী দুটি ব্যঞ্জনধ্বনিই যদি পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভিন্ন

ব্যঞ্জন ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে পারস্পারিক বা অন্যোন্য সমীভবন বলে।

যেমন- উৎ+শ্বাস>উচ্ছাস

মহোৎসব>মোচ্ছব।

টিপ্পনী

বিষমীভবন

সমীভবনের বিপরীত প্রক্রিয়া হল বিষমীভবন । বিষমীভবনে পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমব্যঞ্জন ধ্বনির একে অপরের প্রভাবে যদি বিষমব্যঞ্জন ধ্বনিতে পরিনত হয় তবে বিষমীভবন বলে।

যেমন- লালা>লাল

পিপীলিকা>কিপিল্লিকা

আর্মারিও (আ+র্+ম্+আ+র্+ই+ও) > আলমারি (আ+ ল্+ম্+আ+র্+ই) [এখানে দুটি 'র' এর মধ্যা একটি পরিবর্তিত হয়ে 'ল' হয়ে গেছে]।

(ঘ) ধ্বনির স্থানান্তর বা বিপর্যস

শব্দের মধ্যে কাছাকাছি অবস্থিত দুটিধ্বনি যদি নিজেদের মধ্যে স্থান বিনিময় করে তবে সেই প্রক্রিয়াকে বিপর্যাস বলে।

যেমন- বাক্স>বাস্ক

ব + আ+ ক+ স+ অ > ব+আ+স্+ক+অ [এখানে 'ক' এবং 'স' নিজেদের মধ্যে স্থান বিনিময় করেছে]

তেমনি- রিকশা>রিশকা

দূরস্থধ্বনির বিপর্যাস/স্পুনারিজম

শব্দের মধ্যে পাশাপাশি দুটি ধ্বনি যেমন স্থানবিনিময় করে তেমনি একটি বাক্যের মধ্যে ঔ পরস্পর থেকে দূরে অবস্থিত ধ্বনির মধ্যে স্থান বিনিময় ঘটে এই প্রক্রিয়াকে দূরস্থ ধ্বনির বিপর্যাস বলে।

যেমন- এক কাপ চা>এক চাপ কা

গলে জল হয়ে গেছে>জলে গল হয়ে গেছে।

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. বাংলা ভষায় ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ গুলি লেখ।

২. ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা বা সূত্রগুলি আলোচনা কর।

৩. সংজ্ঞা সহ উদাহরন দাও - আদিস্বরাগম ; মধ্যাস্বরাগম / বিপ্রকর্ষ / স্বরভক্তি, অপিনিহিত, সমীভবন, শ্রুতিধ্বনি, আদিস্বর লোপ, মধ্যস্বর লোপ, অন্ত্যস্বর লোপ, অভিশ্রুতি, স্বরসঙ্গতি।

৪. ধ্বনির রূপান্তর কাকে বলে উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

৫. ধ্বনি বিপর্যস কাকে বলে দৃষ্টান্ত সহ আলোচনা কর।

৬. ধ্বনির লোপ কত প্রকার কি কি আলোচনা কর।

৭. ধ্বনির আগম কতপ্রকার ও কি কি আলোচনা কর।

৮. সমক্ষর লোপ ও সমবর্ণ লোপ কাকে বলে উদাহরণ সহ আলোচনা কর।

৯. সমীভবন ও বিষমী ভবনের পার্থক্য দেখাও।

১০. সমীভবন ও বিষমীভবনের দৃষ্টান্ত দাও।

১১. সমীভবন কত প্রকার কি কি ?

ঋনস্বীকার

১. "সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা" ড. রামেশ্বর শ, পুস্তক বিপনি, কোলকাতা-৯

২. "ভাষা বিদ্যা পরিচয়" শ্রী পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য - জয়দূর্গা লাইব্রেরী, কোলকাতা-৯

টিপ্পনী

টিপ্পনী

চতুর্থ একক

(ক) রূপতত্ত্ব ও বাংলাভাষা

টিপ্পনী

রূপমূল

রূপমূল শব্দটি ইংরেজি 'Morpheme' শব্দের প্রতিশব্দ। ভাষাবিদরা এই 'Morpheme' কে মূলরূপ, রূপমূল বা রূপিম প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন। ধ্বনি এবং শব্দ নিয়ে রূপতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। আমরা জানি একাধিক ধ্বনির সংযোগে শব্দের উৎপত্তি। প্রতিটি শব্দ হয়ে অর্থবহ, ধ্বনি পরবর্তী বৃহত্তর একক শব্দ। ধ্বনির পরেএবং শব্দের মধ্যবর্তী এককই রূপমূল বা রূপিম, ড. রামেশ্বর শ মহাশয়ের মন্তব্য -

"রূপিম বা মূলরূপ (Morpheme) হল এক বা একাধিক স্বনিমের সমন্বয়ে গঠিত এমন অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক যা পৌনঃপুনিক এবং যার অংশবিশেষের সঙ্গে অন্য শব্দের ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য নেই।"

ভাষাবিজ্ঞানী ব্লুমফিল্ড্ রূপিমের সংজ্ঞায় বললেন -

"A linguistic from, which bears no partial phonetic - semantic resemblance to any other form is a simple or morpheme."

ভাষাবিজ্ঞানী "Outlines of Linguistic Analysis" এ ব্লক এবং ট্রেগার জানালেন -

"Any form, whether free or bound which cannot be divided in to smaller meaningful parts is a MORPHEME."

রূপিমের বৈশিষ্ট্য

ড. শ বলেছেন "কোনো ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টিকে রূপিম বা মূলরূপ হতে হলে তাকে চারটি শর্ত একই সঙ্গে পূরণ করতে হয়ে।" - এই চারটি শর্ত বা বৈশিষ্ট্য হল -

(ক) রূপিম এক বা একাধিক ধ্বনির মিলন জনিত অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্রতম একক।

টিপ্পনী

(খ) এক একটি ক্ষুদ্রতম এককের একটি অর্থ থাকা বাঞ্ছনীয়।

(গ) এই ক্ষুদ্র এককটি ভাষার মধ্যে বার বার ফিরে আসে। পুরাবৃত্তি রূপিমের একটি বিশেষ ধর্ম।

(ঘ) "সেই এককটির অংশ বিশেষের সঙ্গে অন্য এককের ধ্বনিগত ও অর্থগত মিল থাকবে না।"

যে ক্ষুদ্রতম ধ্বনি বা ধ্বনি সমষ্টি উপরোক্ত চারটি শর্ত পূরণ করবে তাকে রূপিম বলা যেতে পারে। 'আমের', 'জামের', 'লোকটি' শব্দ গুলিতে দুটি করে রূপিম আছে।

আমের = 'আম' এবং 'এর'

লোকটি = 'লোক' এবং 'টি'

জামের = 'জাম' এবং 'এর'

মানুষকে = 'মানুষ' এবং 'কে'

আম, লোক, জাম, মানুষ - এক একটি মূলরূপ, আবার 'এর', 'টি', 'কে', এগুলি রূপিম তবে এরা একা ব্যবহৃত হতে পারে না। কখনো কখনো একাধিক অক্ষরে গঠিত রূপমূল দেখা যায়। যেমন -

হালকা, পলকা রূপিম গুলি গঠনগত দিক হল - হাল্ + কা = হালকা, পল + কা = পলকা।

ক্ষুদ্রতম একক বা রূপমূল ভাষার মধ্যে বারবার ফিরে আসে যেমন - আমের, ফলের, জামের শব্দগুলিতে 'এর' রূপিম বারবার ফিরে এসেছে, অনুরূপ ইংরাজিতে ও দেখা যায় যেমন - Kindly, Frankly, Frelndly প্রভৃতি।

ধ্বনি গত সাদৃশ্যের অভাবজনিত উদাহরণ হিসাবে ড. রামেশ্বর শ জানালেন -

(১) 'মাতৃচরণে করি প্রণাম' এবং (২) 'আমি মায়ের চরণ দর্শন করতে এসেছি।' 'মাতৃচরণ' এবং 'চরণ' শব্দটিকে মূলরূপ বলা যায় না, ধ্বনি সমষ্ঠি হল মূলরূপ বলা যেতে।

রূপভেদ (Allomorph)

রূপিমেরঅবস্থানগত বৈচিত্র্য কে রূপভেদ বা উপরূপ বলা হয়। ক্ষুদ্রতম একক বা ধ্বনিগুচ্ছের মধ্যে সামান্য পার্থক্য থাকলেও তাদের মধ্যে যদি অর্থগত ঐক্য থাকে তাহলে রূপিম বলা যেতে পারে। ধ্বনিগত পরিবর্তনের ফলে একটা পার্থক্য তৈরি হয় এদের রূভেদ বা উপরূপ (Allomorph) বলে। যেমন - সঞ্চয়, সম্পূর্ণ, সংহার শব্দগুলির 'সন', সম', 'সঙ' অংশগুলির মধ্যে অর্থগতমিল ও পরিপূর্ণতা বর্তমান। কিন্তু ধ্বিগত মিল নেই। পার্থক্য হল ন, ম, ঙ ধ্বনিগুলিতে এইগুলি প্রথে 'সম' ছিল পরে কোন ধ্বনির প্রভাবে তা বদলে গিয়ে এমন রূপ ধারণ করেছে। এর দ্বারা বোঝা যায় সবগুলিই একই রূপমূলের রূপভেদ। রূপভেদে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক কিছু প্রত্যয় হল -

দিদি - ই

শিবানী - আনী

মাতঙ্গিনী - ইনী

প্রত্যেক আলাদা আলাদা স্থানে অবস্থান করছে এগুলি উপরূপ মাত্র।

রূপমূলের সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া

চলমান ভাষার নমুনা সংগ্রহের মধ্যদিয়ে ভাষার ক্ষুদ্রতম মূল উপাদান স্বনিম (Phonene) যেমন নির্ণয় করা হয় ঠিক তেমনি ধ্বনি বা শব্দের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম একক মূলরূপ নির্ণয় করা হয়। ভাষার দুই বা ততোধিক শব্দ সংগ্রহ করে তাদের মধ্যে তুলনার মধ্য দিয়ে রূপমূলের সনাক্তকরণের প্রক্রিয়া চলে। রূপমূলের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রতম এককের মধ্যে ধ্বনিগত ও অর্থগত সাদৃশ্য থাকতে হয়ে। এই ক্ষুদ্রতম অংশের একটা অর্থ থাকতে হয়ে। যেমন -

কাচ্ের = কাচ্ + এর

খালের = খাল্ + এর

দুটি শব্দের 'এর' অংশ দুটিরূপিম 'এর' এর মধ্যে সাদৃশ্য আছে এবং সম্বন্ধ যুক্ত।

"রূপিম নির্ণয়ের সময় ক্রমশ অধিক সংখ্যক শব্দের মধ্যে তুলনা করতে হয়।

টিপ্পনী

টিপ্পনী

এভাবে তুলনা করতে করতে বিভিন্ন শব্দের মধ্যে পার্থক্যসূচক অংশের আয়তন বাড়তে থাকে এবং সাদৃশ্যযুক্ত অংশটি ক্রমশ ছোট হতে থাকে। এইভাবে যধাসম্ভব অধিক সংখ্যক শব্দের মধ্যে তুলনা করে শব্দগুলির মধ্যে সাদৃশ্যযুক্ত যে অংশটি পাওয়া যায় সেইটাই হল একটা রূপিম (Morpheme)।" যেমন-

করদাতা

অন্নদাতা

বস্ত্রদাতা

এখানে তিনটি শব্দের মধ্যে সাদৃশ্য 'দাতা' পরে আর একটি শব্দ যোগ করলে দেখা যাবে-

করদাতা

অন্নদাতা

বস্ত্রদাতা

গৃহকর্তা

শব্দগুলির মধ্যে পার্থক্যের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং নিকট সাদৃশ্য যুক্ত ধ্বনি গুচ্ছ হল- 'তা' এই 'তা' হল রূপিম

শ্রীচরণ

আচরণ

মরণ

স্মরণ

এর ক্ষেত্রে 'অন' নামক ধ্বনি গুচ্ছ হল অর্থপূর্ণ ক্ষুদ্র একক বা রূপিম।

প্রশ্নাবলী

ক. রূপমূল কাকে বলে? রূপিমের বা রূপমূলের বৈশিষ্টগুলি আলোচনা কর।

খ. রূপমূলের সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া পর্যালোচনা করে দেখাও।

রূপভেদের কারণ

কোন কোন সময় অর্থগত সাদৃশ্যের কারণে রূপভেদ হয়ে থাকে। কোন রূপিমের একাধিক উপরূপ থাকতে পারে যে সবগুলি নিয়েই রূপিম। সব রূপিমের উপরূপ নাও থাকতে পারে। দুটি শব্দের মধ্যে ধ্বনিগত সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলায় স্ত্রীলিঙ্গ ক্ষেত্রে প্রত্যয় জনিত কারণ - আ, ধকা, আনী, ই, ঈ প্রভৃতি। ইংরাজিতে বহুবচনের প্রত্যয় s, es, z, en প্রভৃতি। আবার "যখন রূপতাত্ত্বিক কারণে (অর্থাৎ শব্দরূপ ধাতুরূপ ইত্যাদিতে) একটি রূপিম বিভিন্ন পরিবেশে (Distribution) অল্পস্বল্প ধ্বনি পরিবর্তন লাভ করে তখন সেই ধ্বনি পরিবর্তনকে রূপগত বা রূপতত্ত্ব প্রভাবিত ধ্বনি পরিবর্তন (Morpho phonemic change) বলে।

ধাতুর স্বরসংগতি জনিত কারণে রূপভেদ ঘটে। অনেক সময় ধ্বনিগত সাদৃশ্য থাকলেও অর্থগত সাদৃশ্য দেখা যায় না তার কারণেও রূপভেদ দেখা যায়। রূপতত্ত্ব প্রভাবজনিত ধ্বনিপরিবর্তন - বাংলা 'কর' ধাতুর স্বরসঙ্গতি জনিত -

আমি করি

তুমি করো

তুই কর

সে করে

সমধ্বনিরূপ শব্দের অংশে ধ্বনিগত সাদৃশ্য আছে কিন্তু অর্থগত মিলনেই যেমন - 'সে নদীর পাড়ে কুল পাড়ে।' 'পাড়ে' র ধ্বনিগত সাম্য আছে কিন্তু অর্থগত মিল দেখা যায় না।

রূপিম বা মূলরূপের সাহায্যে শব্দগঠন করা যায়। এই রূপিমই ভাষার শব্দগঠনের মূল উপাদান একক রূপিম হল - মা, পা, এ, ভাই, বোন প্রভৃতি এক বা একাধিক যুক্ত রূপিমের সঙ্গে একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগে সব্দ সৃষ্টি হয়। যেমন -

মিতা + আলি = মিতালি

কীর্তন + ইয়া = কীর্তনিয়া

বলে রাখা প্রয়োজন রূপিম দুই প্রকার (ক) মুক্ত বাস্বচ্ছন্দ রূপিম (Free

টিপ্পনী

টিপ্পনী

Morpheme) এবং (খ) বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme)। মা,ভাই, আম- মুক্ত রূপিম কারণ এই ধ্বনিগুচ্ছ অন্য কারো সঙ্গে যুক্ত না হয়ে স্বাধীন ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। অপর দিকে যে অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি সমষ্ঠি অন্যধ্বনি গুচ্ছের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় তাকে বদ্ধ রূপিম বলে। যেমন -

আমের

জামের

ছেলেটি

দিদি

এর, টি, দি অন্য শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হয় তাই এটি বদ্ধরূপিম। বদ্ধরূপিম সহযোগে সৃষ্ট বাংলা শব্দ -

গম্ + অনট্ (অন) = গমন

সৃজ + ক্ত (ত) = সৃষ্ট

সৃজ + অনট্ (অন্) = সৃজন

ভাঙ + ছি = ভাঙছি

রাত + এর= রাতের প্রভৃতি

শব্দ ও পদের পার্থক্য

ভাব বিনিময়ের প্রয়োজনে মানুষ বাগযন্ত্রের সাহায্যে কিছু কিছু শব্দ ব্যবহার করে থাকে যা কতকগুলি ধ্বনির সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়। এই অর্থময় ধ্বনি সমষ্টিই শব্দ। কয়েকটি অবিভাজ্য ধ্বনি অংশ মিলে শব্দের উৎপত্তি। যেমন -

মধু = ম্ + ও + ধ্+উ

লতা = ল্ + অ + ত্ + আ

মধু শব্দটি চারটি ধ্বনির সমষ্টিতে গঠিত।

ইংরেজিতে শব্দ হল Word, শব্দের মাধ্যমে যে ধ্বনি থাকে তা প্রকাশের জন্য

যে চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে বর্ণ বলে। বিভক্তি বিহীন সার্থক বর্ণ সমষ্টির নাম প্রাতিপাদিক বা প্রকৃতি। প্রকৃতির দুটি বিভাগ - (১) নাম প্রাতিকপাদিক ও (২) ধাতু প্রাতিপাদিক

ব্যকরণে নাম প্রাতিপাদিক বা শব্দ বাক্যে ব্যবহৃত হলে পদে পরিণত হয়। এই নাম শব্দ গুলিকে বাক্যে প্রযুক্ত হতে গেলে অতিরিক্ত কিছু বর্ণ বা বর্ণ সমষ্টি সংযোগের প্রয়োজন আবশ্যিক। এই অতিরিক্ত বর্ণ বা বর্ন সমষ্টি 'বিভক্তি'। বিভক্তি আবার দুই প্রকার (১) শব্দ বিভক্তি ও (২) ক্রিয়া বিভক্তি।

টিপ্পনী

যেমন - রাত থেকে, নদীতে, রামের - এখানে 'থেকে', 'তে', এর বর্ণগুচ্ছ শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়ে সার্থক বাক্য গড়ে তোলে। এই শব্দবা নাম প্রকৃতি বাক্যে ব্যবহৃত হলে পদে পরিণত হয়।

(খ) ব্যাকরণ শব্দনির্মাণ (Derivation) ও পদনির্মাণ

অর্থবহ ধ্বনি সমষ্টিই শব্দ। যে কোন ভাষার সম্পদ হল তার শব্দ। তাই যে ভাষা যত উন্নত ভাষার শব্দভান্ডার তত সমৃদ্ধ। শব্দের ক্ষুদ্রতম একক হল রূপিম, রূপিমই শব্দগঠনের মূল উপাদান। সাধারণত শব্দের দুটি দিক - (ক) গঠনগত বা আকারগত দিক (খ) অর্থগত দিক।

এ সম্পর্কে Ben Jonon এর মন্তব্য -

"In all speech, words and sense are as the body and soul."

ভাষাবিদগন কেউ কেউ বাংলা শব্দের গঠন কে দুই বা তিনভাগে দেখিয়েছেন। ড. রামেশ্বর শ দেখিয়েছেন বাংলা শব্দের গঠন হয় তিন ভাগে। যেমন -

(ক) একক রূপিমের সাহায্যে।

(খ) একাধিক রূপিমের সাহায্যে। এর আবার দুটি বিভাগ দেখানে হয়েছে -

(১) একাধিক বদ্ধ রূপিমের সঙ্গেএকাধিক বদ্ধ রূপিম মিলে শব্দ গঠিত হয়।

(২) একাধিক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে এক বা একাধিক বদ্ধ রূপিমের সংযোগ।

টিপ্পনী

(গ) আবার একটি শব্দের সঙ্গে অপরএকটি শব্দের মিলনে।

কোন কোন ভাষাবিদ শব্দের গঠনমূলক শ্রেনী বিভাগকে দুটি শ্রেনীতে বিভক্ত করে দেখিয়েছেন, (১) মৌলিক শব্দ এবং (২) সাধিত শব্দ।

(১) মৌলিক শব্দ - যে সকল শব্দ একটি মাত্র রূপিম অর্থাৎ যে সকলল সার্থকশব্দকে ভাঙা যায় না তাকে মৌলিক বা স্বয়ং সিদ্ধ শব্দ বলে। এই বিশ্লেষণ অযোগ্য আকারের নাম প্রকৃতি অনেক সময় প্রাতিপাদিক ও বলা হয়। যেমন লত, বৃক্ষ, মা, ভাই, রং, চল্ প্রভৃতি অর্থযুক্ত অবিভাজ্য শব্দ। অনেকে বাংলা অব্যয়, উপসর্গ ও ধন্যাত্মন শব্দগুলিকে এই পর্যায়ে রাখার পক্ষপাতী।

(২) সাধিত শব্দ - যে সকল শব্দ ভাঙা বা বিশ্লেষণ যোগ এবং ভঙ্গ অংশগুলি শব্দের সঙ্গে অর্থবহ হয়ে ওঠে তাকে সাধিত শব্দ বলা হয়।

যেমন - রাখাল (রাক্ + আল), নদীমাতৃক (নদী + মা+তৃচ + ক), নমনীয়, পাঠনীয় প্রভৃতি।

সাধিত শব্দকে দুটিভাগে বিভক্ত করা যায় - (ক) প্রত্যয় - নিষ্পন্ন শব্দ (খ) **সমাসবদ্ধ শব্দ**

যে শব্দে ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দে গঠিত হয় তাকে প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ বলে। যেমন - পঠনীয় = পাঠ + অনীয়, বক্তব্য, দূর্গমতা শব্দ গুলি ধাতুর সঙ্গে প্রত্যয় মিলনে সৃষ্ট শব্দ।

সাধিত শব্দে এক বা একাধিক মৌলিক বা প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ পাওয়া যায় সেগুলিই সমাসবদ্ধ শব্দ। যেমন - রক্তপদ্ম, ভাইবোন, শ্রবন-মনন, নরনারী, পঞ্চবদী, দশানন, প্রভৃতি শব্দ।

(খ) শব্দের অর্থগত অনুসরনে তিনটি বিভাগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন - (১) যৌগিক শব্দ (২) রূঢ়িশব্দ (৩) যোগরূঢ় শব্দ।

(১) যৌগিক শব্দ - যে শব্দের অর্থ সাধারণত প্রকৃতি প্রত্যয় থেকে প্রতীয়মান হয় তাকে যৌগিক শব্দের তালিকা ভুক্ত করতে পারি। উদাহরণ হিসাবে-

চরণ = চর্ + অন (যার সাহায্যে গমন বা চলা বোঝায়)

(২) রূঢ়ি শব্দ - যে শব্দের অর্থ প্রকৃতি জাত অর্থকে না বুঝিয়ে অন্য ব্যবহারিক অর্থকে বোঝায়, তাকে রূঢ়ি শব্দ বলা হয়। যেমন -

পলাশ = পল অর্থে মাসে আর আশ অর্থে খাদ্য এই মূল উৎসের অর্থ না বুঝিয়ে এখন 'ফুল' অর্থে ব্যবহৃত হয়।

জেঠ্যামি = জেঠা + আমি, এই অর্থ না হয়ে এখন জ্যেষ্ঠের বা পরিপক্কের আবরণ বোঝায়।

রাখাল, কুশল ও রূঢ়ি শব্দের পর্যায় ভুক্ত।

(৩) যোগরূঢ়ি শব্দ - কোন শব্দের পরকৃতি প্রত্যয় জাত যে সকল অর্থ হয়। তার মধ্যে থেকে মাত্র একটি অর্থকে বোঝালে যোগরূঢ়ি শব্দ বলে।

যেমন, পীতাম্বর, জলধর, পঙ্কজ, সুহৃদ প্রভৃতি, এখানে পীতাম্বর পীত বস্ত্র ধারণকারী সবাইকে না বুঝিয়ে একমাত্র শ্রিকৃষ্ণকেই নির্দেশ করছে।

এক বা একাধিকপদ নিয়ে বাক্য গঠিত হয়। এই পদ গুলি প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের একটি সমন্বয় বা অন্বয়যুক্ত। প্রতিটি পদ আসক্তি ও অর্থযুক্ত হয়ে থাকে। বাক্যের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় পদের উল্লেখ করেছেন -

"যেপদ বা শব্দ সমষ্টির দ্বারা কোনও বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে বক্তার ভাব প্রকটিত হয়, সেই পদ বা শব্দ সমষ্টিকে বাক্য (Sentence) বলে।"

একাধিক ধ্বনির সংযোগ পদ এবং একাধিক পদের সমাহারে বাক্য তৈরি হয়, এই পদ গুলির মধ্যে তিনটি বিষয় থাকতে হয়ে - যোগ্যতা, আসক্তি এবং আকাঙ্খা।

প্রত্যয় নিষ্পন্ন শব্দ গুলি যখন বাক্যে সার্থকরূপে ব্যবহৃত হয় তখন আমরা তাকে 'পদ' বলে থাকি।

কতকগুলি শব্দ হল - সূর্য, জল, ঝড়, দিক, পূর্ব, পশ্চিম, বাড়ি, জল, কাগজ, কলম, বই, ইট, পাথর প্রভৃতি এগুলি একা একা এক একটি শব্দ বিশেষ কিন্তু যখন শব্দগুলি বিভক্তি সহযোগে বাক্যে ব্যবহৃত হয় খন তাদের পদ বলতে পারি।

উদাহরণ হিসাবে -

সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। এখানে দিক এর সঙ্গে এ যুক্ত হয়ে সার্থক বাক্য গঠন

টিপ্পনী

টিপ্পনী

করেছে। প্রতিটি শব্দ এখানে পাশাপাশি বিভক্তি যুক্ত হয়ে বসে বক্তার সম্পূর্ণ ভাবে প্রকাশ করেছে। এখানে বাক্যে ব্যবহৃত শব্দগুলি পদরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। ড. সুকুমার সেন মহাশয় পদবিধির বিচার সম্পর্কে বলেছেন -

"পদবিধির বিচারে পদের শ্রেনী বিভাগ হয় - এই রূপ বিশেষণ বিশেষ্য ; সর্বনাম ; ক্রিয়া - বিশেষণ; কারক বিভক্তি স্থানীয় ও প্রত্যয় বাচক শব্দ।"

ক্রিয়া- পদের সঙ্গে নামপদের সম্বন্ধকে কারক বলা হয়। ক্রিয়াপদ ও নামপদ গুরুত্বপূর্ণ সম্বন্ধপদ ও সমান গুরুত্বপূর্ণ। বাক্যে ব্যবহৃত পদ বিন্যাস (Word order) যথাযথ হওয়া চাই।

(গ) পদবন্ধ (Phrase) ও বাক্যনির্মাণ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা

পদবন্ধ ও বাক্য নির্মাণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে বাক্যে সম্বন্ধে আলোচনা প্রয়োজন।

আমাদের মুখনিসৃত সার্থক পদসমষ্টি যখন একটি অর্থের দ্যোতনা সৃষ্টি করে তখন তাকে বাক্য বলা হয় । Bloomfield বাক্য সম্পর্কে জানালেন - "an independent from, not included in any larger (complex) linguistic form."

ড. রমেশ্বর শ 'সাধারন ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা' গ্রন্থে বাক্য সম্পর্কে মন্তব্য -

"আমাদের বাক্য প্রবাহকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথম আমরা যে বৃহত্তম এককগুলি (Units) পাই সেই এককগুলিই হল বাক্য । বর্ণনামুলক ভাষা বিজ্ঞানে বাক্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভাষার বৃহত্তম স্বয়ংসম্পূর্ণ এককরূপে । ভাষার যে অবয়বটি (Form) স্বয়ংসম্পূর্ণ, যে অবয়বটি অন্য কোন বৃহত্তর অবয়বের অংশ নয়, তাকে বাক্য বলা হয়েছে।"

অর্থপূর্ণ পদবন্ধকে আমরা বাক্য বলে জানি । যে কোন স্বয়ংসম্পূর্ণ বাক্য বিশ্লেষণে পদবন্ধ পাওয়া যায়। যেমন -

'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণাধারায় এসো ।' এখানে - 'জীবন যখন

শুকায়ে যায়' এই পদসমষ্ঠি একটি উপবাক্যমাত্র। এর থেকেক্ষুদ্র 'জীবন যখন' এর একটি অর্থ আছে কিন্তু খন্ডিত স্বসম্পূর্ণ নয়। এই ধরনের ছোট ছোট পদ সমষ্টিকে পদগুচ্ছ বা পদবন্ধ (Phrase) বলা হয়। বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে পদবন্ধের গুরুত্ব সর্বাধিক। ভাষা বিজ্ঞানীরা একটি বাক্যকলে ভেঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাদান বের করেছেন। যেমন -

'মানুষ' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে দাঁড়ায় -

মানুষ = ম্+আ+ন্+উ+ষ, এগুলি শদ গঠনের একক। ধ্বনি - শব্দ-পদগুচ্ছ-উপবাক্য এগুলি বাক্য গঠনের উপাদান।

মনের ভাব ব্যক্ত করার মাধ্যম বাক্য। বাক্যনির্মাণের বিশেষ রীতি পদ্ধতি বর্তমান। বাংলা বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে আকাঙ্খা, যোগ্যতা, আসক্তি যেমন যথার্থ প্রয়োজন তেমনি পদক্রম - কর্তা-কর্ম-ক্রিয়া অনুসরনে বাক্য পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে। বাক্য বিশ্লেষণে দুটি অংশ প্রধান -

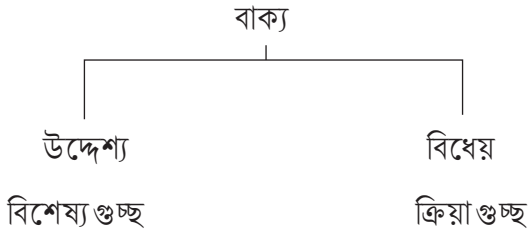

গঠন অনুসারে বাক্যকে তিনটি শ্রেনীতে বিভক্ত করা যায় - (১) সরল বাক্য (২) জটিলবাক্য (৩) যৌগিক বাক্য।

অর্থ অনুসারে বাক্যকে বিভিন্ন শ্রেনীতে বিভক্ত করা যায় -

(১)নির্দেশক বাক্য (২) প্রশ্নবোধক বাক্য (৩) ইচ্ছাবোধক বাক্য (৪) আদেশ মুলক বাকভ (৫) বিস্ময়মূলক বাক্য প্রভৃতি।

বাক্যপদের সমষ্টি এই পদগুলিকে তাদের ধর্ম অনুসারে শ্রেনীবিভাগ করা যায়। যেমন - বিশেষ্য,সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, অব্যয় প্রভৃতি। বাক্যগঠনের ক্ষেত্রে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ রূপিম নামক অর্থপূর্ণ একক।

ড. রামেশ্বর শ মহাশয় বৃহত্তর একক থেকে বাক্যকে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্রতর উপাদানে বিভক্ত করেছেন তা চিত্রটি নিম্নে প্রদান করা হল -

টিপ্পনী

মানুষ যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন তখন প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ এনে দিলেন বিভূতিভুষণ

মানুষ যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন | তখন প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ এনে দিলেন বিভূতিভূষণ

মানুষ | যখন যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন | তখন প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ এনে দিলেন | বিভূতিভুষণ

যখন | যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় বিপন্ন | তখন | প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ এনে দিলেন

যন্ত্রযুগের যান্ত্রিকতায় | বিপন্ন | প্রকৃতির স্নিগ্ধ স্পর্শ | এনে দিলেন

যন্ত্রযুগের | যান্ত্রিকতায় | প্রকৃতির | স্নিগ্ধ স্পর্শ | এনে | দিলেন

স্নিগ্ধ | স্পর্শ

ড. রমেশ্বরশ, সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা গ্রন্থের চিত্র নং - ৪৩

টিপ্পনী

আদর্শ প্রশ্নাবলী

১. রূপমূল কাকে বলে? বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২. রূপভেদের কারণগুলি উল্লেখ কর।

৩. শব্দ ও পদের পার্থক নির্দেশ কর।

৪. ব্যকরণের শব্দ নির্মাণ ও পদ নির্মাণ সম্বন্ধেবিস্তারিত আলোচনা করে দেখাও।

৫. পদবন্ধ ও বাক্য নির্মাণ সম্বন্ধে সাধারন ধারণা নিজের ভাষায় লেখ।

৬. রূপমূলের সনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার পরিচয় দাও।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১. "সরল ভাষা প্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ" - ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

২. "সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা" - ড. রামেশ্বর শ.।

৩. "ভাষার ইতিবৃত্ত" - ড. সুকুমার সেন।

৪. বাংলা ভাষাতত্ত্ব" - ড. কৃষ্ণগোপাল রায়।

টিপ্পনী